পূর্ব ভারত
(PURVA BHARAT)
মানুষ ও সংস্কৃতি
ISSN 2319-8591

বর্ষ : ৭ সংখ্যা : ২ ডিসেম্বর, ২০২৪

প্রকাশক

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

গভ. রেজিঃ নং - S/1L/79269(2011)

শোভাগঞ্জ, পোঃ আলিপুরদুয়ার, জেলা - আলিপুরদুয়ার

যোগাযোগের ঠিকানা

ডঃ সুলেখা পন্ডিত, পূর্বাচল, ২য় বাই লেন, কোর্ট কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড নং ১,
পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২২

ইমেল- eastindiansocietyapd@gmail.com

Website : https:\\eastindiansociety.org

দূরভাষ: - 9434630784 (সভাপতি), 7407018862 (সম্পাদক),
9434494655 (সহ সম্পাদক), 9733134588 (কর্মসমিতি সদস্য)

Copyright 2023 ©
All Rights Reserved by
East Indian Society for the Studies of Social Sciences.

The "East Indian Society for the Studies of Social Sciences" was established more than a decade ago; and its official journey was flagged off on the 5th of April, 2011, when it was registered under the societies Registration Act (West Bengal XXVI, 1961) with the Reg. No. S/1L/ 79269 (2011-2012) of the Government of West Bengal. It is a Non-Government and nonprofit organization pledged to carry on the mission of research in social sciences with India in general and Eastern-India in particular as the main theme in its objective of interdisciplinary explorations. As a part of multi-faceted social activities of the society, two biannual peer reviewed Journals namely "East Indian Journal of Social Sciences" (in English language) & "Purva Bharat" (Manus O Sanskriti) in Bengali Language with ISSN are being published regularly. Seminars and debates on significant topics are held as many times as financially possible in a year.

পূর্ব ভারত

(PURVA BHARAT)

মানুষ ও সংস্কৃতি

(ISSN 2319-8591)

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গবেষণা পত্রিকার কোন প্রবন্ধ কিংবা প্রবন্ধের কোন অংশের কোনরূপ পুনঃপ্রকাশ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রকাশক

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

গভ. রেজিঃ নং - S/1L/79269(2011)

শোভাগঞ্জ, পোঃ আলিপুরদুয়ার, জেলা - আলিপুরদুয়ার

প্রকাশ কাল ডিসেম্বর, ২০২৩

©ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

প্রচ্ছদ

স্বাধীন ঝা

মূদ্রণ

বিয়ন্ড হরাইজন পাবলিকেশন

৯৪৩৪৬৩৩০০৫

সংগ্রহ মূল্য

ব্যক্তিগত (বার্ষিক) ৭০০ টাকা (ভারতীয় টাকা)

প্রতিষ্ঠান (বার্ষিক) ৮০০ টাকা (ভারতীয় টাকা)

প্রাপ্তিস্থানঃ ড. সুলেখা পন্ডিত, পূর্বাচল, ২য় বাই লেন, কোর্ট কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড নং ১,
পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২২

দূরভাষ: - 9434630784(সভাপতি),7407018862(সম্পাদক),
9434494655(সহ সম্পাদক), 9733134588(কর্মসমিতি সদস্য)

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

কার্য নির্বাহী সমিতি

সভাপতি
ড. সুলেখা পন্ডিত

সহ-সভাপতি
পুষ্পজিৎ সরকার

সম্পাদক
সুজয় দেবনাথ

সহকারী সম্পাদক
জয়দীপ সিং

কোষাধ্যক্ষ
অনুপ রঞ্জন দে
কৌশিক চক্রবর্তী

মুখ্য সম্পাদক
ড. সুলেখা পন্ডিত
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

সহযোগী সম্পাদক

স্বাধীন ঝা
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

ড. অখিল সরকার,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, নবদ্বীপ , নদীয়া

ড. সুভাষ সিংহ রায়
অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ,
চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

পরীক্ষক মণ্ডলী

প্রফেসর (ড.) দীপক কুমার রায়
উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ
পূর্বতন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় , পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) রূপ কুমার বর্মণ
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) মাধবচন্দ্র অধিকারী
পূর্বতন ডিন, কলা অনুষদ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) কার্তিক চন্দ্র সুত্রধর
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) মনোশান্ত বিশ্বাস
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সিধু কানু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) পলাশ মণ্ডল
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সিধু কানু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) সোমদত্তা ভট্টাচার্য
অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) শ্রাবণী ঘোষ
অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

সম্পাদকের একটি কলি

বাংলা নেই, বঙ্গভূমি দ্বিখন্ডিত, বাঙালি নেই, আছে বর্ধিষ্ণু জেহাদির দল, সাহিত্য সৃজনহীন, বঙ্গসংস্কৃতি অপশৃয়মান। প্রকটিত উম্মা-কেন্দ্রীক মৌলবাদ। ওপারের সাহিত্য ও সংস্কৃতি তালিবানের পথে। আবার এপার বাংলার রাজধানীতে ভারতবিরোধী শ্লোগান। নিরাপরাধ মানুষ খুন ও সন্ত্রাসবাদবিরোধী ন্যায়-যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিলে পাক-পন্থী বামোন্মাদনার বিকট বহিঃপ্রকাশ। মানবিকতা ভূলুণ্ঠিত। ছিঃ।

কোথায় সেই জ্ঞাপপ্রদীপ শীলভদ্র এবং অতীশের দেশ! এ তো পঙ্কিলগ্রস্থ, জরাদীর্ণ, রোগগ্রস্থ এক কটিল সমাজ! এই সমাজের সুস্থ শরীর নেই, ধ্যানী মন নেই, একাগ্রতা নেই, মহৎ জাতীয় লক্ষ্য নেই, এগিয়ে যাবার স্বপ্ন নেই, ভবিষ্যতের আলো নেই। আছে শুধু হাহাকার আর পতনের ত্বরান্বিত গতি।

সেই পরিবেশেই বেড়িয়ে এসেছে 'পূর্ব ভারত' এক ঊষর ভূমিতে পাংশু সমাজের বুকে। জ্ঞান-প্রদীপ কি আর জ্বলবে?

সুলেখা পন্ডিত
সম্পাদক

আলিপুরদুয়ার
১২ ডিসেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

১১
নির্মল প্রধান
খেরওয়ার আন্দোলন: সাঁওতাল বিদ্রোহের নবরূপ
(১৭৬৫-১৮৮১)

২৭
হেমেন্দ্র নাথ মণ্ডল
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমাজ, অর্থনীতি ও
রাজনৈতিক ভাবনা- একটি পর্যালোচনা

৪৩
গুরুশংকর বারিক
জাতীয় আন্দোলনে মেলা ও হাটের ভূমিকা: দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে একটি
আলোচনা (১৯০৫-১৯৪৪)

৫৪
মোঃ নাসির আহমেদ
স্বাধীনতা পরবর্তী মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতের অন্তর্ভুক্তি :
একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

৬৫
ড. সঞ্জয় পাল
অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম
উপন্যাসে বর্ণিত অন্ত্যজ সমাজজীবনের চিত্র

৭১
রাসবিহারী জানা
খেলাধূলার ইতিহাসে প্রতিস্পর্ধী বাঙ্গালীদের ভূমিকা

৮৩
সুরাট সরকার
বাংলা চলচ্চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় :
এক কিংবদন্তি বাঙালি অভিনেতা

৯৯
স্বাধীন ঝা
পুস্তক পর্যালোচনা

 ISSN-2319-8591

খেরওয়ার আন্দোলন: সাঁওতাল বিদ্রোহের নবরূপ (১৭৬৫-১৮৮১)

নির্মল প্রধান
পি. এইচ. ডি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
অতিথি অধ্যাপক, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের আদিবাসী বিদ্রোহের ইতিহাসে খেরওয়ার আন্দোলন একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বুকে এটি ছিল একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গণ অভ্যুত্থান। 'খেরওয়ার' সাঁওতাল জনজাতির একটি প্রাচীন নাম এবং এটি জনজাতি বা উপজাতীয় স্বর্ণযুগের ইতিহাসে এক প্রতিচ্ছবি বহন করে। খেরওয়াররা নিজেদের 'খাঁটি সাঁওতাল' বা 'সাফাহড়' বলে অভিহিত করে। 'সাফা' মানে পবিত্র এবং 'হড়' মানে সাঁওতাল। খেরওয়ার আন্দোলন ছিল ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তী শুদ্ধিকরণ আন্দোলন। ইতিহাসের পাতায় ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ যতটা চর্চিত হয়েছে, ১৮৫৫ এর পরবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া ১৮৬১, ১৮৬৫ ও ১৮৭০ সালে বিদ্রোহ ততটা আলোচনার পরিসারে আসেনি। তাই আলোচ্য নিবন্ধে খেরওয়ার আন্দোলনের (১৮৭০) নানা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করে বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতটা রয়েছে তা পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সূচক শব্দঃ হিহিরি-পিপিরি, সামন্তপাল, খেরওয়ার, সাফাহড়, সাঁওতাল, দামিন-ই-কোহ।

(ক)

ঔপনিবেশিক ভারতে সংগঠিত আদিবাসী বিদ্রোহগুলির মধ্যে অন্যতম হল খেরওয়ার আন্দোলন। এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ১৮৭০ এর দশকে। এই আন্দোলনকে অনেকে সাঁওতাল বিদ্রোহের বর্ধিত রূপ হিসাবে বিবেচনা করে। অর্থাৎ সাঁওতাল বিদ্রোহের সাথে খেরওয়ার আন্দোলনের একটি যোগসূত্র রয়েছে। এই বিষয়টি অবগত হওয়ার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ভূমি বন্দোবস্তের দিকে। ১৭৬৯ সালে সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে চলে যায়। এই সময়কালে যে তিন ধারায় ঔপনিবেশিক শোষণ বিরোধী অভুত্থান দানা বেঁধে ছিল তার একটি ছিল আদিবাসী জনজাতির বিদ্রোহ। সাঁওতাল বিদ্রোহের আমরা প্রাথমিক রূপ লক্ষ করি ১৭৮১-৮৪ সালে সংগঠিত তিলকা মাঝির নেতৃত্বে।

তারপর আরো কয়েকবার সংগঠিত হলেও ১৮৫৫ সালে সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরবের নেতৃত্বে সংগঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহের বিস্তৃতি ছিল সর্বব্যাপী। পরবর্তীকালে খেরওয়ার ও ১৯৩২ সালে জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে আবার মালদায় এই বিদ্রোহ নবরূপে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৭০ সালে খেরওয়ার আন্দোলন আলোচনার পূর্বে জানা প্রয়োজন সাঁওতাল কারা, তাদের আদি বসতি কোথায়, আদিবাসী বিদ্রোহের চরিত্রগুলি কি রূপ অথবা ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের চরিত্র কি রূপ ছিল ইত্যাদি বিষয়গুলি। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে ঐতিহাসিক কালিকিঙ্কর দত্ত থেকে শুরু করে উইলিয়াম উইলসন হান্টার, দিগম্বর চক্রবর্তী, নরহরি কবিরাজ, সুপ্রকাশ রায়, বিনয়ভূষণ চৌধুরী, অধুনা নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ, সাম্প্রতিক গবেষক ও অধ্যাপক শুচিব্রত সেন, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, প্রথমা ব্যানার্জি প্রমুখরা নানান তথ্য প্রদান করেছেন। আবার খেরওয়ার আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে এস.পি.সিনহা, পল.এ.বোডিং, স্ক্রেসফুড, শুচিব্রত সেন, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ কুমার, কবিতা প্রসাদ প্রমুখরা নানা মতামত প্রদান করেছেন।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক সাঁওতাল কারা বা কী তাদের পরিচয়। ভারতবর্ষের আদিবসতকারী মানবই আদিবাসী। এক গোষ্ঠীর মানুষ যারা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বসবাস করে, যাদের একটি নির্দিষ্ট দৈহিক আকৃতি বিদ্যমান, একই ভাষায় কথা বলে, একই ধরনের নিজস্ব সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর সমতা রক্ষা করে নির্দিষ্ট ছন্দে ও বন্ধনে আবদ্ধ তাদের আদিবাসী বা উপজাতি বলে। ১৯৭৬ সালে 'দি সিডিউল্ড কাস্টস এন্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস অর্ডার অ্যাক্ট' অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৩৮টি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল উপজাতিরা ছিল অন্যতম। স্ক্রেসফুড সাহেব মনে করেন যে 'সাওনতার' শব্দের অপভ্রংশ থেকে সাঁওতাল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।[১] আবার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে - 'সামন্তপাল' শব্দটি থেকে 'সাঁওতাল' নামের উৎপত্তি। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস তার 'সাঁওতাল বাংলা সমশব্দ অভিধান' এর সূচনায় বলেন - কোল-মুন্ডা গোষ্ঠীর খেরোয়ালদের সাঁওতাল নামকরণ সম্ভবত বিমিশ্রিত আর্যভাষী।[২] পরিমল হেমব্রম সাঁত দিশম নামটির সঙ্গে 'সাঁওতাল' শব্দটির গভীর সম্পর্ক আছে বলে মত প্রকাশ করেন।[৩]

সাঁওতালদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল অথবা প্রাচীনকালে তাদের কোন স্থান থেকে আগমন ঘটেছে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অত্যন্ত দূরহ। তবে সর্বপ্রথম তারা সিরি নামক কোনো এক অরণ্যের পাদদেশে 'হিহিরি-পিপিরি' নামক কোনো এক স্থানে বসবাস করত বলে জনমত প্রচলিত। এই সিরি নামক অরণ্য ও হিহিরি-পিপিরি নামক স্থান যে কোথায় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কেউ কেউ সাঁওতালি পিপিরি শব্দের অর্থ প্রজাপতি ধরে 'হিহিরি-পিপিরি' অর্থে প্রজাপতির দেশ অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশ বলে অভিহিত করেন। তবে এটি কেবলমাত্র অনুমানভিত্তিক।[৪] ওয়াল্টার হ্যামিলটনের 'Description of Hindustan' (1820) গ্রন্থে প্রথম সাঁওতালদের উল্লেখ পাওয়া যায়। হ্যামিলটন সাহেব এ প্রসঙ্গে বলেন যে, এরা হল 'a poor downtrodden class lived in the jungles'। কয়েক বছর আগে এই জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা ঘুরতে ঘুরতে সাঁওন্তা বা শিলদায় এসে পড়ে। এই জায়গার নাম অনুযায়ী এদের নাম হয়

সাঁওতার বা সাঁওতাল। পরবর্তীকালে এই স্থানটির নাম হয় সান্তাভূই।[৫] মূলত বাংলা ও বিহারের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে মূলত বীরভূম ও ভাগলপুরের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত সাঁওতাল পরগণাই ছিল তাদের বসতি কেন্দ্র, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখা যায় যে জঙ্গলমহলের কৃষি ব্যবস্থায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আবার পরবর্তীকালে ১৮৩২-৩৩ সালে ১৩৬৬.০১ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট 'দামিন-ই-কো' অর্থাৎ রাজমহল, পাকুড়-গোড্ডা এবং দুমকার বেশ কিছু অংশে বসতি গড়ে তুলছে এই উপজাতি সাঁওতালরা।

(খ)

প্রতিটি উপজাতি বিদ্রোহের মতো সাঁওতাল বিদ্রোহ তথা খেরওয়ার আন্দোলন তার নিজস্ব চরিত্র চিত্রণের দাবি রাখে। তবে এই বিদ্রোহ বা আন্দোলনের চরিত্র আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন আদিবাসী বিদ্রোহের চরিত্র কীরূপ ছিল। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষক বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন। গবেষক ও অধ্যাপক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় আদিবাসী বিদ্রোহের চরিত্র নিরূপণে মূলত পাঁচটি বিষয়েকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে। প্রথমত- সামাজিক স্বীকৃতি তথা অধিকার আদায়জনিত আন্দোলন (Social mobility movement), দ্বিতীয়ত- ধর্মীয় আবেগযুক্ত পরিত্রাণ প্রাপ্তির আন্দোলন (Messianic movement), তৃতীয়ত- উপজাতীয় সংহতি বিধানের উদ্দেশ্যে আন্দোলন (Tribal Solidarity movement), চতুর্থত- উপজাতীয় পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন (Tribal revitalization), পঞ্চমত- প্রবণতা সম্বলিত আন্দোলন (Sub-nationalism and intra nationalism)।[৬] কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে আদিবাসী আন্দোলনের চরিত্র প্রসঙ্গে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেন যথা - পুনঃস্থাপন মূলক (Restorative), সংস্কারমূলক (Reformative) ও রাজনৈতিক স্বতন্ত্রবাদী (Political autonomy)।[৭] আবার জ্যোৎস্না সিংহরায় ভারতবর্ষের আদিবাসী বিদ্রোহগুলিকে 'উপজাতীয় দাঙ্গাহাঙ্গামা', 'ইতরজনের উচ্ছৃঙ্খলতা', 'নির্বিচার লুঠতরাজ' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করেছেন।[৮]

এই বিদ্রোহের কারণগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে মর্যাদাহানি, আর্থিক কারণ, ধর্মীয় উপস্থিতি ইত্যাদির চেয়েও এটি ছিল সাঁওতালদের স্বপ্নের স্বভূমি ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টা। তবে এই বিদ্রোহ আজও বহু চর্চিত বিষয় এবং বিভিন্ন তথ্যের সমাবেশে তার চরিত্র বিশ্লেষণেও নানা দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত হয়েছে। খেরওয়ার আন্দোলনের চরিত্র আলোচনা পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন সাঁওতাল বিদ্রোহের চরিত্রটি। মূলত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত- এই বিদ্রোহ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের নানা দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বিতীয়ত- সাঁওতালরা নিজেরা কী ভেবেছিলেন এই বিদ্রোহ সম্পর্কে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম প্রামাণ্য বিবরণ দেন উইলিয়াম উইলসন হান্টার। তিনি মূলত ইংরেজ বিচারপতি বা বিদেশি আধিকারিকদের না দায়ী করে এই বিদ্রোহের জন্য অসাধু হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজনদের দোষারোপ করেছেন। অতি সামান্য ঋণ পরিশোধ করতে সাঁওতালদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে হয়েছে।[৯] ব্র্যাডলে বার্ট মত

প্রকাশ করে বলেন যে, এই বিদ্রোহ ছিল দেশীয় মহাজন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পুরোপুরিভাবে সাঁওতালদের নীচুতলার স্তরে নামিয়ে এনেছিল মহাজনরা। এইরূপ পরিস্থিতি সাঁওতালদের বিদ্রোহী করে তুলতে বাধ্য করেছিল।[১০] এই বিদ্রোহের অন্যতম প্রবক্তা কালিকিঙ্কর দত্ত বিদ্রোহের নানা তথ্য তথা দামিন-ই-কো এর বিবরণ, বিদ্রোহের সূচনা, উন্নতি, দমন, পরিণতি প্রভৃতি বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি এই বিদ্রোহের জন্য সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অসন্তোষকে মূলত দায়ী করেছেন। সাঁওতালরা জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব বিভাগের অত্যাচার এমনকি বহিরাগত ব্যবসায়ী তথা মহাজনদের ঋণের জালে জর্জরিত হওয়ার কারণে বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়।[১১] আবার ভারতীয়দের মধ্যে পাকুড়ের অধিবাসী দিগম্বর চক্রবর্তী সর্বপ্রথম ইংরেজিতে সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করেন। দিশেহারা সাঁওতালদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপন্নতার বিষয়টি তুলে ধরে তিনি 'ভকতবন্ধ' বলে একটি প্রথার কথা উল্লেখ করেন। 'ভকত'রা ছিল ভাগলপুর দিক থেকে আসা এক কুসীদজীবী সম্প্রদায়। এরা দাদন দিত এবং ফসল কেড়ে নিত। এককথায় এরা সাঁওতালদের ঋণের দায়ে জর্জরিত করে তুলত। এই বিদ্রোহে সাঁওতাল ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যেমন- কামার, কুমোর, গোয়ালা জেলে প্রভৃতি। উপজাতি সম্প্রদায়ের তরফ থেকে কোড়া, মাহালি প্রভৃতি জনজাতির অংশগ্রহণ রয়েছে এই বিদ্রোহে, যা বিদ্রোহের পথকে একটি পরিপূর্ণতার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিল।[১২]

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ১৮৫৫-৫৬ সালের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে বলেন যে এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক দিগ্‌দর্শন। অর্থনৈতিক স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাঁওতালরা যে সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল তা মুক্তিকামী মানুষের কাছে চিরস্মরণীয়। তিনি এই বিদ্রোহকে একটি সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতার চেয়ে আর কিছু বড় ভাবনা তাদের ছিল না, তাই তারা স্বাধীনভাবে বাঁচার পথ নির্মাণের জন্য স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্যের দাবি তুলেছিল এবং অত্যাচারী ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল।[১৩]

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়- সাঁওতাল বিদ্রোহকে সামন্ততন্ত্র ও উপনিবেশিক শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতের খেটে খাওয়া মানুষের এক উজ্জ্বল গণ-জাগরণ বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> "১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে অতুলনীয়। কেবলমাত্র ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সহিত ইহার আংশিক আবেগ তুলনা করা চলে। এই সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল ইংরেজ শাসনের কবল হইতে, শোষণের কবল হইতে মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি লইয়া"।[১৪]

নরহরি কবিরাজ বলেন যে- সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়ে উঠেছিল সমস্ত গরিব সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি মুক্তিযুদ্ধ। সাঁওতাল যুবকরা ছিল এই বিদ্রোহের মূল চালিকাশক্তি। সাঁওতাল কিশোর ও বৃদ্ধরাও এই বিদ্রোহে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেছিল। এমনকি মেয়েরাও দলে দলে এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। উপজাতি অন্তর্ভুক্ত না হয়েও

কামার, কুমোর, তাঁতি, তেলি, গোয়ালা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষরা দলে দলে ভিড় জমিয়েছিল বিদ্রোহ ক্ষেত্রে। এমনকি মুসলমান তাঁতিরাও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।[১৫] আবার ধর্মীয় অনুপ্রেরণাও এই বিদ্রোহকে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে বিপানচন্দ্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সাঁওতালরা বিশ্বাস করতেন তাদের এই কাজের পিছনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে। দুই প্রধান বিরোধী নেতা সিধু ও কানু দাবি করেছিলেন ঠাকুর (ভগবান) তাদের দেখা দিয়ে বলেছেন অস্ত্র হাতে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হবে। এক ঘোষণায় সিধু কর্তৃপক্ষকে বলেন —

> "ঠাকুর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এই দেশ সাহেবদের দেশ নয়। ...
> ঠাকুর স্বয়ং লড়াই করবেন। সুতরাং আপনারা সাহেবরা ও সৈন্যরা
> স্বয়ং ঠাকুরের বিরুদ্ধেই লড়াই করবেন"।[১৬]

বিনয়ভূষণ চৌধুরীও এই বিদ্রোহের ধর্মীয় দিকটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তিনি বলেন যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিধু ও কানু ঘোষণা করে, ভিনদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত তাদের নিজেদের নয়; সাক্ষাৎ ভগবান (ঠাকুর) তাদের কাছে আবির্ভূত হয়ে একথা বলে গেছেন, তাদের সংগ্রামে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন। তাই দিব্যশক্তি প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করবে বলে তাদের জয় সুনিশ্চিত। এই ঘোষণার পরেই সাঁওতালদের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয় কেটে গেল। দুর্বার এক আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা 'হুলের' জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।[১৭] তিতাস চক্রবর্তীও দেখিয়েছেন ১৮৩০ সালে প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের পর দামিন-ই-কো এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধর্মের মধ্য দিয়ে কিভাবে সাঁওতালরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তার বিবরণ।[১৮] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন যে, বহিরাগত দিকুদের প্রবেশের ফলে সাঁওতালদের পরিচিত জীবনের ছন্দপতন ঘটে। তাই তারা বাধ্য হয়ে নিজ নিজ ভিটেমাটি ফিরে পাওয়ার আশায় লড়াইয়ের ময়দানে নামতে বাধ্য হয়েছিল।[১৯] সুনীল সেন এই বিদ্রোহ প্রসঙ্গে বলেন যে- সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল নিঃসন্দেহে একটি কৃষক বিদ্রোহ। কেননা কৃষকরাই ছিলেন বিদ্রোহের মূল চালিকাশক্তি। তাদের সাহস ও বীরত্ব এই বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করেছিল।[২০]

আবার সাঁওতাল বিদ্রোহ বা উপজাতি বিদ্রোহগুলি প্রসঙ্গে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা নানা তথ্য প্রদান করে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রধান বক্তা ছিলেন রণজিৎ গুহ। তাঁর মতে উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ, বিশেষ করে সাঁওতাল বিদ্রোহে কৃষকের চেতনা প্রস্ফুটিত হয়। তিনি সাঁওতাল বিদ্রোহকে 'নিম্নবর্গের আন্দোলন' বলে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনার অস্তিত্বকে প্রাধান্য দান করেন। অধ্যাপক গুহ 'মারে হাপরাম রেয়োকো কো' (Mare Hapram Ko Reak kotha) কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে- সাঁওতালরা বিভিন্ন অঞ্চলে পবিত্র পাতা প্রদানের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তুলেছিল।[২১] ভব রায় সাঁওতাল বিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণের প্রেক্ষিতে ব্যেক এর 'Dual Economy' বা দুতলা অর্থনীতি- এর তত্ত্বটি ব্যবহার করেছেন, যেখানে তিনি সাঁওতালদের অসন্তোষের ক্ষেত্রে নিচু তলার অর্থনীতি(2nd Sector)- এর সংযোগ লক্ষ্য করেছেন।[২২]

অধ্যাপক শুচিব্রত সেন সাঁওতাল বিদ্রোহকে দেখেছেন এক আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম হিসাবে। এক্ষেত্রে তিনি সাঁওতালদের যে নিম্নবর্গীয় অভিধান সেটাকে অস্বীকার

করেছেন।[২৩] তিনি মত প্রকাশ করেন যে, সাঁওতালরা কোনোদিনই হিন্দু চতুর্বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখানেই সাঁওতালদের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যান্য নিচু সম্প্রদায়ের পার্থক্য। সাঁওতালরা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলত 'আবো দো হড় জাতি'। তারা যে হিন্দুদের চাইতে উঁচু জাতের তার প্রমাণ পাওয়া যেত 'দেখু খোনাং আবু গেবান সরেসা' - এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে।[২৪] অধ্যাপক সেন জাত্যাভিমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বাঁকুড়া জেলার ক্যালশ (Culshaw) এর বিবরণ উল্লেখ করে সাঁওতালদের সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন যে, সাঁওতাল রমণীরা ব্রাহ্মণদের তৈরি করা রান্না গ্রহণ করতেন না।[২৫] অর্থাৎ সাঁওতালরা অর্থনৈতিকভাবে অবদমিত হলেও নিজের জাতিসত্ত্বার বিষয়টিকে উঁচু স্থানে নির্মিত করেছিল।

সাম্প্রতিক গবেষক ও অধ্যাপক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রসঙ্গে বলেন যে- এই বিদ্রোহ আদিবাসীদের কট্টর মনোভাব থেকে গড়ে উঠেছিল। কারণ হিসাবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, একমাত্র কট্টর পন্থার মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা তাদের নিজেদের রাজ্য গঠনের স্বপ্নকে সফল করতে পারবে। এই বিদ্রোহের মূল চরিত্র ছিল ধর্মকেন্দ্রিক এবং ঈশ্বর নির্ভরশীলতা।[২৬] তিনি সাঁওতাল বিদ্রোহের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে মন্ডলী প্রথার অস্তিত্বকে দায়ী করেছেন, কারণ মন্ডলরা বা মাঝিরা সাঁওতালদের স্বার্থকে না দেখে জমিদারদের স্বার্থকে বড় করে দেখার চেষ্টা করছে। মাঝিদের জমিদারগণ আমলাতন্ত্রে পরিণত করেছে। আবার যখন থেকে ব্রিটিশরা ভারতে এসে ক্ষমতা বিস্তার করতে শুরু করল তখন মাঝিদের ভূমিকা বদলে গেল। তখন তারা হয়ে গেল সরকারি আমলা বা সরকারের মনোনীত ব্যক্তি।[২৭] অর্থাৎ সাঁওতাল বিদ্রোহের ক্ষেত্রে মন্ডলী প্রথার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আবার সাম্প্রতিক গবেষক প্রথমা ব্যানার্জি তাঁর প্রবন্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল কারণ হিসাবে 'সময়' যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।[২৮]

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে এবার আলোচনা করা যাক সাঁওতালরা নিজেরা কি ভেবেছিলেন এই বিদ্রোহ সম্পর্কে। এক্ষেত্রে অধ্যাপক শুচিব্রত সেন সুন্দরভাবে কয়েকটি সাঁওতাল গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে তাদের বিদ্রোহের কাহিনি তুলে ধরেছেন।

প্রথমত, কেন এই বিদ্রোহ?

"আমাদের জমি, আমাদের দেশের জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব
আমাদের হাল, গরুর জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব
আমাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব"।

দ্বিতীয়ত চেতনার উপলব্ধি —

"বণিক দস্যুরা আমাদের সর্বস্ব অপহরণ করেছে
সাহেব শাসন বড়োই কষ্টদায়ক
খাদ্য, পানীয়, পোশাক সবকিছুই
সমস্যার সংকুল
আমরা যাব কি থাকব?"

তৃতীয়ত- বিদ্রোহ কাদের নিয়ে?

"আমরা আমাদের নিজেদের যুদ্ধ
নিজেরাই করব
কেউ আমাদের সাহায্য করবে না
কেবল মাঝি ও অন্যান্য সাঁওতালরা
আমাদের সাহায্য করবে
কেউ আমাদের পক্ষে নেই
তবু আমরা বিদ্রোহ করব"।[২৯]

অর্থাৎ এই সমস্ত গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা নিজেদের বিদ্রোহ সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা পরাজিত হলেও তাতে তাদের কোনো দুঃখ বা আক্ষেপ ছিল না। বলা যেতে পারে নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকরা সাঁওতালদের হয়ে কথা বললেও তারা কিন্তু নিজেদের কথা নিজেরাই বলেছেন।

(গ)

এবার আলোচনা করা যাক আলোচ্য নিবন্ধের মূল বিষয় হিসাবে 'খেরওয়ার আন্দোলন'। এককথায় বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে সাঁওতাল পরগণায় যে শুদ্ধি আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তা বিদ্রোহের ইতিহাসে 'খেরওয়ার আন্দোলন' নামে পরিচিত। 'খেরওয়ার' শব্দটি একটি পুরানো এবং খুব পরিচিত 'খাইর' থেকে এসেছে, যার অর্থ মানুষ, স্ক্রেসফ্রুডের (Skresfrud) বলেন- 'খাইর' শব্দের উৎপত্তি সমগ্র ভারতে অসংখ্য উপজাতি ও স্থানের নাম থেকে পাওয়া যেতে পারে। 'খেরওয়ার' সাঁওতালদের প্রাচীন উপজাতির নাম। তাদের কাছে এটি ইতিহাসের স্বর্ণালী যুগের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যখন তারা নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় চম্পায় বাস করত এবং তাদের কোনো ভাড়া দেওয়ার বিষয় ছিল না।[৩০] চম্পার গুরুত্ব সম্পর্কে ব্র্যাডলি বার্ট একটি সুন্দর বর্ণনা দেন তা হল -

> "ঐতিহ্য বারবার চম্পার সেইসব বছরগুলিতে ফিরে গেছে, সেই পুরনো ভালো দিনগুলিতে, যখন উপজাতিগুলি তাদের অধীনে বড় জমি নিয়ে শান্তিতে ছিল এবং হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনো বিদেশি ছিল না। এই সুবর্ণ যুগে সাঁওতালদের জন্য উপজাতির রীতিনীতি বা বিধি ছাড়া অন্য কোনো আইন ছিল না, তারা ঐতিহ্য ও প্রথানুসারে সেসব নিয়মকেই মান্য করত। জমি তখনও তার ছিল, আজকের সাঁওতালদের কাছে শোষণের সব পথ থাকা সত্ত্বেও খাজনা তখনও অজানা ছিল। তার ইচ্ছামতন জঙ্গলের যতটা কাঠ কাটা যায়, অরণ্য আইন দ্বারা তা তখনই নিষিদ্ধ হয়নি। চম্পা ও অন্যত্র স্বাধীনতার এই দিনগুলি সাঁওতাল চেতনায় এমনভাবে স্থান নিয়েছে যে, আজও সে বুঝতে ভুল করে কীভাবে কোনো শক্তি ও আইন, অথবা কোনো কর্তৃত্ব, জমি এবং ইচ্ছামতন যথেষ্ট কাঠ কাটার চিরকালীন অধিকার তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে"।[৩১]

১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের ব্যর্থতা এবং হুলের পরেও সাঁওতালরা নানা পরিবর্তন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলেও স্বাধীন সাঁওতালরাজ গড়ার স্বপ্নে তারা অনড়। ১৮৫৫ এর পরের দশকগুলিতে সাঁওতালদের জীবনকে চিহ্নিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল একটি নতুন সামাজিক ধর্মীয় চেতনার উত্থান যা খেরওয়ার আন্দোলনের জন্ম দেয়। তবে খেরওয়ার আন্দোলনের তাৎক্ষণিক পটভূমি খোঁজ করা কঠিন নয়। পন্ডিতদের মধ্যে খেরওয়ার আন্দোলনকে একটি সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার হিসাবে দেখার এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এর উৎস খুঁজে বের করার এক সাধারণ প্রবণতা রয়েছে। স্ক্রেসফ্রুডের মতে, খেরওয়ার আন্দোলন ছিল এক উচ্ছৃঙ্খল, সমাজতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন।[৩২]

বুদ্ধেশ্বর টুডু তাঁর রচিত গ্রন্থে বলেন যে, ভারতবর্ষে প্রথম জনগণনা শুরু হয় ১৮৭২ সালে, এই সময় সাঁওতাল পরগনায় জমি জরিপকে কেন্দ্র করে শুরু হয় নানা অশান্তি, তিনি এই অশান্তির পোশাকি নাম দেন 'খেরওয়ার বিদ্রোহ'। এই বিদ্রোহের মূল নায়ক ছিলেন ভগীরথ মাঝি, অপর নেতা জ্ঞান পরগনা, যারা উভয়ই ছিলেন তালডিহার অধিবাসী।[৩৩] খ্রিস্টান মিশনারীরাও খেরওয়ার আন্দোলনের উপর বিশেষ নজরদারি করেন। তারা মনে করেন যে, এই আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক, ধর্ম একটি ছদ্মবেশী রূপ মাত্র। ১৮৭৫ সালের ৯ই মার্চ ভাগলপুরের কমিশনার বলেন, সাঁওতালরা তাদের জাতির পূর্ব নাম 'খেরওয়ার' কথাটা পুনরায় ব্যবহার করতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে বিনয় চৌধুরী এই আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে এরূপ মন্তব্য করেন যে—

> "এটাকে নতুন এক সামাজিক দর্শন বলা যায়। অথচ এ দর্শন সমানভাবে গ্রহণ করা সব সাঁওতালদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেমন- মোরগ, শুয়োর ইত্যাদি নিঃশেষে মেরে ফেলার নির্দেশ বহু সাঁওতালদের পক্ষে একটা অবাস্তব দাবি বলে মনে হয়েছে, কারণ এদের প্রতিপালন সাঁওতাল অর্থনীতির একটা বিশেষ দিক। তাছাড়া দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাস হঠাৎ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া অনেকের পক্ষে কঠিন ছিল, তাই দীক্ষিত এবং সক্রিয় খেরওয়ারদের সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল। বস্তুত একারণে তারা বৃহত্তর সাঁওতাল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল"।[৩৪]

নানা সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়েও খেরওয়ার আন্দোলনের চরিত্র ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে অমল কুমার দাস ও শ্রী দিলীপ সরেন-এর বক্তব্য বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য। অমল কুমার দাস, শ্রী দিলীপ সরেনকে প্রশ্ন করেন, ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তীকালে আর কোনো আন্দোলন ঘটেছিল কি না। এরূপ প্রশ্নের উত্তরে উত্তর দাতা শ্রী দিলীপ সরেন বলেন —

> "পরবর্তীকালে যখন সাঁওতালদের খ্রিস্টান করা হচ্ছিল, তখন 'সাফা হড়' আন্দোলন দেখা দেয় ভাগরিত বাবার নেতৃত্বে। সমস্যা দেখা দিলে সামাজিক সমস্যাও রাজনীতিক হয়ে দাঁড়ায়। সাঁওতাল সমাজ গণতান্ত্রিক। তাই প্রথম দিকে ভাগরিত বাবা পরিচালিত 'সাফা হড়' আন্দোলন ছিল 'Socio religions' কিন্তু পরে গান্ধীজি

পরিচালিত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়”।[৩৫]

অধ্যাপক ও গবেষক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় খেরওয়ার আন্দোলনের প্রসঙ্গে বলেন যে, ১৮৭৪ সালের আগে ১৮৬০ এর দশকে সাঁওতালদের দ্বারা পর্যায়ক্রমে সংগঠিত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন সাঁওতাল পরগনা জেলার নানা অঞ্চলগুলিকে দোলা দিতে থাকে। এই সময় একটি নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনার উত্থান ঘটতে শুরু করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাঁওতালদের অবস্থা সবদিক থেকে খারাপ হতে থাকে। আবার ১৮৬৬ এবং ১৮৭৩-৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ সাঁওতালদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। অর্থাৎ সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে সাঁওতালরা ব্রিটিশ সরকার, জমিদার ও মহাজনদের হাতে এত বেশি শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল যে তারা কার্যত ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। তাই ১৮৫৫ সালে তাদের ব্যর্থতা তাদের নতুন সংগ্রামের কৌশল পরিবর্তন করতে প্ররোচিত করেছিল অর্থাৎ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খেরওয়ার আন্দোলন ছিল সাঁওতালদের পরিচয়ের দাবিতে একটি নতুন শুদ্ধিকরণ আন্দোলন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় খেরওয়ার আন্দোলনের প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন যা মনোগ্রাহী। যেমন প্রথমত- যদিও খেরওয়ার আন্দোলন একটি সামাজিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন বলে মনে হয়েছিল কিন্তু এটি ছিল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন, কারণ এর রাজনৈতিক সুর প্রথম থেকেই স্পষ্ট ছিল। দ্বিতীয়ত- ‘সাফা হড়’ খেরওয়ার মতাদর্শের জন্মকে একটি নতুন আদর্শ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কারণ শুদ্ধিকরণের ধারণাটি হুলের সময়ে অনুপস্থিত ছিল। তৃতীয়ত- ‘খেরওয়ার মতাদর্শ’ ধারণার উপর ভিত্তি করে সাঁওতালরা একসময় একটি স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্যের স্বপ্নে শক্তিশালী বসতি ছিল। এই খেরওয়ার আন্দোলন সাঁওতালদের মধ্যে অতীত ইতিহাস চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। ভগীরথ যখন তার আন্দোলনের জন্য সাঁওতাল জাতির পুরোনো নাম ‘খেরওয়ার’ তৈরি করেছিলেন এবং সাঁওতালদের এখন থেকে এই নামে ডাকতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি আসলে সাঁওতালদের পুরানো অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। আবার খেরওয়ার আন্দোলন যে উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে ধারা ধরে চলেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[৩৬]

অধ্যাপক শুচিব্রত সেনের বক্তব্য এক্ষেত্রে গুরুত্বের দাবি রাখে। তিনি বলেন ১৮৭৮ সালে সংগঠিত এই খেরওয়ার বা শুদ্ধিকরণ আন্দোলন বাস্তবে কতটা রূপদান করেছিল তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক অযথা হইচই করেছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সাঁওতালদের এই বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল না। উক্ত অঞ্চলটিতে সাঁওতালদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে তীব্র অনীহা লক্ষ করা যায়।[৩৭] ১৮৫৫ সালের বিদ্রোহের পরবর্তীকালে সাঁওতালরা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের দুর্দশার কারণস্বরূপ যে সমস্ত দুর্বলতাগুলি রয়েছে সেগুলি খুব দ্রুত সংশোধন করা প্রয়োজন। এই বিষয়টি কিন্তু নতুন নয়। কেননা প্রত্যেকটি জাতি গোষ্ঠী নিজ নিজ পরাজয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে অতীতের থেকে শিক্ষা নেয়। একসময় ইংরেজদেরও এর মাসুল দিতে হয়েছিল। তাই সাঁওতাল উপজাতি গোষ্ঠীও এর ব্যতিক্রম নয়। একসময় কারু মাঝি নামে এক

সাঁওতাল নিজেকে গোঁসাই বা দেবতার সমমর্যাদা হিসাবে স্বীকার করতেন। সাঁওতাল সমাজে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, কারু নাকি আর্থিক দুর্দশার স্বীকারগ্রস্ত সাঁওতালদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতেন। এই কারণে নানান অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা দলে দলে কারুর দেবী বাগমতীরের এক পীঠস্থানে সমবেত হতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জালিয়াতির অভিযোগে কারুকে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। অধ্যাপক শুচিব্রত সেন মনে করেন কারুর এই আন্দোলনের আন্দোলন অপেক্ষা খেরওয়ার বা সাফা হড় আন্দোলন অনেক বৃহৎ পরিসরে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল। এক্ষেত্রে ভগীরথ মাঝি ও তার ঘনিষ্ঠ দুই সহযোগীর নেতৃত্বদান গুরুত্বের দাবি রাখে। মঙ্গল দাস গোঁসাই কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ভগীরথ দক্ষিণ ভাগলপুরের এক হিন্দু মন্দিরে নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলে সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেন।[৩৮]

ভগীরথ 'বাবাজি' নামে পরিচিত ছিলেন। সমসাময়িক কালে নানান তথ্য থেকে জানা যায় যে, দর্শনার্থীরা শালপাতার নির্মিত পাত্রে আতপ চাল, এক ঘটি গরুর দুধ, একগুচ্ছ পান পাতা এবং টাকা পয়সা প্রণামী সহ বাবাজির শরণাপন্ন হয়ে নানা অভিযোগ পেশ করত। অভিযোগের পালা সমাপ্তির পর বাবাজি থেকে এই রকম উত্তর আসত যে, অভিযোগকারীদের নানা আর্জি তিনি (বাবাজি) চাঁদো কাটার কাছে তুলে ধরবেন। যার আর্জি শুনে চাঁদো ও বাবা আনন্দিত হবেন সেই দর্শনার্থী মুক্তি পাবে। আর চাঁদো বাবা অসন্তুষ্ট হলে সেই অভিযোগকারীকে বারবার এসে আর্জি জানাতে হবে। এই রূপ আরো নানা নির্দেশ পালনের কারণে একসময় ভগীরথের কাছে দর্শনার্থীর আগমনের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। পরক্ষণেও নানা নির্দেশ পালনের কথা ভগীরথ দর্শনার্থীদের বলেন। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। অবশেষে ভগীরথকে কারারুদ্ধ করা হয়। ফলে খেরওয়ার আন্দোলনে সাময়িক ভাটা পড়ে। কিন্তু ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, যার নেতৃত্ব প্রদান করেন দুবিয়া গোঁসাই।[৩৯] এ প্রসঙ্গে পল.এ.বোডিং উল্লেখ করেন যে, নেতাদের কারারুদ্ধ হওয়ার পর এই আন্দোলন কিছুটা ম্লান হয়েছিল। তবে স্ক্রেসফ্রুডের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হোডনে (Hodne) বিশ্বাস করেন যে, ১৮৭৭ সালে ভগীরথ মুক্তির পর সম্পূর্ণভাবে সমস্ত রাজনৈতিক বিষয় এড়িয়ে গিয়ে একজন শান্ত ও শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সংস্কারক রূপে বসতি স্থাপন করেন।[৪০]

সাম্প্রতিক গবেষক তৃপ্তি চৌধুরী এই আন্দোলনকে মূলত দুটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। প্রথম পর্যায়ের সময়কাল ১৮৭৪-৭৫, যার নেতৃত্ব দান করেন গোড্ডার ভগীরথ মাঝি, দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল ১৮৮০-১৮৮২, যার নেতা ছিলেন দুবিয়া গোঁসাই। তিনি এই আন্দোলনকে মূলত একটি সামাজিক ধর্মীয় (Socio religious) আন্দোলন বলে অভিহিত করেন, ধর্ম প্রচারকদের লেখার উপর ভিত্তি করে।[৪১]

এবার আলোচনা করা যাক খেরওয়ার আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে নেতা দুবিয়া গোঁসাই এর প্রসঙ্গটি। তিনি ছিলেন দেওঘরের একজন ধর্ম প্রচারক। তাঁর নেতৃত্ব দানে এই আন্দোলন নবরূপে পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। ভগীরথের মতো তিনিও কিছু নীতি পালনের নির্দেশ জারি করেন, যেমন সাঁওতালদের পালিত নানা জীবজন্তু মুরগি ও শুয়োরকে হত্যা করার এবং সমস্ত হিন্দু রীতিনীতিকে মান্য করা। এমনকি তিনি নিজেকে দৈবশক্তির অধিকারী বলে প্রচার করতে থাকেন। এর ফলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে শুরু

করে। শেষ পর্যন্ত গর্ডনের নেতৃত্বে ৪৫০০ জনের একদল পদাতিক ও অশ্বারোহীবাহিনী দুবিয়া গোঁসাইকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে। ফলে এলাকায় আবার শান্তি বিরাজ করে।[৪২] ভগীরথ মাঝি, জ্ঞান পরগনা এবং দুবিয়া গোঁসাইকে গ্রেপ্তার করার ফলে খেরওয়ার আন্দোলন কিছুটা ভাটা পড়লেও ১৮৯১ সালে আবার এই আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই আত্মপ্রকাশে নেতৃত্ব দান করেন বাবাজিরা। বাবাজিদের বক্তব্যেও একই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এরাও উপদেশ দেন হিন্দু রীতিনীতিকে আপন করে নিতে। এমনকি নিজেরাও হিন্দুদের মতো নিরামিষ ভোজন করেন। বুদ্ধেশ্বর টুডু তাঁর গ্রন্থে এই বাবাজিদের প্রসঙ্গে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে—

> "ইদানিং আবির্ভূত এক বাবাজির সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য শোনা যায়। তিনি মেয়েদের ছোঁওয়া জিনিস খেতেন না বলে বাবাজি হবার আগে পাগল হয়েছিলেন। তারপরে জানা গেল ভ্রুণাবস্থায় তিনি নাকি বাবাজি ছিলেন। তিনি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতেন না এবং ছোট বড় সবাইকে এমনকি বাচ্চাদের পর্যন্ত মা-বাবা বলে সম্বোধন করতেন। এসব কথা শুনে দলে দলে লোক তার বাণী শুনবার জন্য আসতে লাগলেন। ভিড় এত বেড়ে যায় যে তার পক্ষে সবাইকে দর্শন দেওয়া সম্ভব হয় না তাই তিনি এক উপায় বার করেন। বাণীর পরিবর্তে বস্ত্র বিতরণ করতে শুরু করেন। মাটি, দূর্বা ঘাস এবং ঘুঁটের ছাই একত্র করে তিন অংশে ভাগ করে একেক অংশ একেক কাজে ব্যবহার করতে উপদেশ দিতেন। বস্তুর এক অংশ জলে গুলে খেতে বলতেন অথবা প্রয়োজনে শরীরে লাগাতে বলতেন। দ্বিতীয় অংশ গবাদি পশুকে দিতে বলতেন যাতে তারা বেশি দুধ দিতে পারে এবং তৃতীয় তথা শেষ অংশ ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে বলতেন"।[৪৩]

এইভাবে বাবাজিরা নানা বিষয় উল্লেখ করে তাদের অবস্থানকে টিকিয়ে রাখতেন। তাঁরা বস্তুজগৎ এবং ভাবজগতের মধ্যম স্থানে অবস্থান করতেন। কেউ কেউ বাবাজিদের এই পেশাকে লাভজনক বলে মনে করলেও বেশিরভাগই মনে করত এই পেশা একটি জনহিতকর সেবামূলক কাজ।

এ প্রসঙ্গে স্ক্রেসফুড ১৮৮০ সালে খেরওয়ার আন্দোলনে তিনটি সম্প্রদায়ের কথা বলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন বিশুদ্ধবাদী বা প্রকৃত সাফা হড় যারা সিংহ বাহিনী (জমিদার প্রধান দেবী) এবং সূর্যের পূজা করে। মদ্যপান এবং নাচগান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন বাবাজি যাদের পেশা ছিল দেশ ভ্রমণ এবং ভিক্ষা করা। তৃতীয় ছিল ভেলওয়ারা গাররা, যারা খেরওয়ারদের সমস্ত রীতিনীতি পালন করেছিল। তিনি খেরওয়ার দেখেছিলেন একটি গোলমেলে আন্দোলন হিসাবে। তাঁর কাছে খেরওয়ারিজম (Kherwarisam) হল- A rapid, socialistic, political agitation, the religion being only a means towards an end". অর্থাৎ একটি দ্রুত সমাজতান্ত্রিক, রাজনৈতিক আন্দোলন, যেখানে ধর্ম হল একটি পরিণতির মাধ্যম মাত্র।[৪৪]

খ্রিস্টান মিশনারীরা খেরওয়ার আন্দোলনকে একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। আয়ারল্যান্ডের ফেনিয়ান আন্দোলনের সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়, জামডার মিশনারী কর্নেলিয়াস মনে করেন খেরওয়ারদের আসল লক্ষ্য ছিল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করা। এক খ্রিস্টান মিশনারীর প্রতিবেদন খেরওয়ার নেতারা সাঁওতালদের এরূপ বক্তব্য প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছিল যে—

> "জমি আমাদেরই; আমরাই জঙ্গল কেটেছি; তাই কোনো খাজনা আমরা দেব না; একজোট হয়ে আমরা ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াবো"।[৪৫]

অধ্যাপক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে জন ম্যাকডোগেল-এর প্রসঙ্গে উল্লেখ করে খেরওয়ার আন্দোলনের সঙ্গে সরদারি লড়াইয়ের তুলনা করেছেন। তিনি বলেন যে সরদারি লড়াই যেখানে গড়ে উঠেছিল মিশনারি অনুপ্রেরণায়, মিশনারি প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের দাবিকে কেন্দ্র করে সেখানে খেরওয়ার আন্দোলনে হিন্দু রীতিনীতি অনুকরণের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে শুদ্ধতা বা পরিচ্ছন্নতা আনার জন্য। তাই সরদারি লড়াইয়ে খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হলেও খেরওয়ার আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের প্রভাব অধিক পড়েছিল।[৪৬] একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে খেরওয়ার আন্দোলনের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত করার ফলে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। ১৮৭২ সালে প্রথম সেন্সাস চলাকালীন এই আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বর্তমানে সাঁওতাল পরগনা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই আন্দোলনের ধারা টিকে রয়েছে।

(ঘ)

উনবিংশ শতাব্দীর আদিবাসী বিদ্রোহের ইতিহাসচর্চার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় অধুনা গবেষকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রেখেছে। ঔপনিবেশিক ভারতে আধিপত্যকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানা কৃষক ও জমিদারদের বিদ্রোহ তথা সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০) থেকে শুরু করে সন্দীপ বিদ্রোহ (১৭৬৯), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), পলিগার বিদ্রোহ (১৭৯২-১৮০১), বেরিলি বিদ্রোহ (১৮১৬), পাইক বিদ্রোহ (১৮১৭) এবং উপজাতি বিদ্রোহ হিসাবে চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৮-৯৯), কোল বিদ্রোহ (১৮৩২) নিয়ে ঐতিহাসিকরা যেমন তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন, ঠিক অনুরূপভাবে সাঁওতাল উপজাতিদের নিয়ে সংগঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহে নানা বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কণ্ঠে। সাঁওতাল বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সাঁওতাল জনজাতি ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল নজিরবিহীন। ১৭৮০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ তিলক মাঝির নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম অভিযান শুরু হলেও তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৩২ সালে জিতু সাঁওতাল ও বরিন্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। তবে এক্ষেত্রে ১৮৫৫-৫৬ সালে সিধু ও কানু, চাঁদ, ভৈরব এর নেতৃত্বে সংগঠিত বিদ্রোহ এবং ১৮৭০-১৮৮১ সালে ভগীরথ মাঝি, দুবিয়া গোঁসাই নেতৃত্বে খেরওয়ার

আন্দোলন ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ তথা সমস্ত আদিবাসী জগতের ভিতকে নড়িয়ে দিয়েছিল। দামিন অঞ্চলে ও জঙ্গলমহলে ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হলেও এই সংগ্রামের স্মৃতি পরবর্তী ১৮৭০-১৮৮১ সালে খেরওয়ার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়। যদিও এই আন্দোলন তার গতি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। কেননা এই আন্দোলন ছিল মূলত সাঁওতালদের ধর্মান্তরিতকরণের একটি কৌশল মাত্র। তাই এর বাস্তবতা নিয়ে নানা ঐতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে খেরওয়ার আন্দোলনই আদিবাসী বিদ্রোহে মধ্যবিত্ত মানুষের চেতনাকে অনেকটাই নতুন পথ দেখিয়েছিল। এই সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোড়া, ডোম, বাউরি, লোহার প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজ জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখতে তৎপর হয়েছিল। এই কারণে হয়তো ঐতিহাসিক সুমিত সরকার খেরওয়ার আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবনমূলক আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন।[৪৭] আবার বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মালদহ জেলার খোচকাঁদড় গ্রামে জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে এই আন্দোলন নবরূপে সাঁওতাল বিদ্রোহকে রূপায়িত করে। এক্ষেত্রে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

সর্বোপরি আমরা একথা বলতে পারি যে সাঁওতাল বিদ্রোহের ঢেউ পরবর্তীকালে অন্যান্য বিদ্রোহকে প্রভাবিত করেছিল, যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহের ঠিক দু-বছরের পরে সংগঠিত মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭) এবং তার পরবর্তী নীল বিদ্রোহের (১৮৫৯)। মহাবিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যতটা তৎপর ছিলেন, অথচ ঠিক তার পূর্ববর্তী ঘটে যাওয়া সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল্যায়নে তাদের দীর্ঘ নীরবতার বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত সমসাময়িককালে কর্মটাড়ে বসবাসকারী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রাজনারায়ণ বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখরা সাঁওতাল বিদ্রোহ তথা খেরওয়ার আন্দোলন সম্পর্কে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। বিদ্রোহের সমাপ্তিপর্বে সাঁওতালরা হয়তো পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তার জন্য হয়তো তাদের কোনো অনুতাপ ছিল না। কেননা তাঁদের বীরত্বের স্মৃতি আগলে রেখে পরবর্তীকালে অন্যান্য আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জাতি-গোষ্ঠীগুলি ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে নানা গণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এখানেই সাঁওতাল বা খেরওয়ার আন্দোলনের সঙ্গে অন্যান্য কৃষক বা উপজাতি বিদ্রোহের মধ্যে তফাৎ লক্ষ করা যায়। কি আত্মত্যাগ, কি মহিমায়, কোনো অংশেই এই জংলী বর্বর সাঁওতালরা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনয়-বাদল-দীনেশ বা সূর্যসেন, ভগৎ সিং-দের তুলনায় কম ছিলেন না। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' যেভাবে মহাবিদ্রোহকে সমর্থন করেছিল ঠিক অনুরূপভাবে আমরা ১৯৫৫ সালে পাঁচু গোপাল ভাদুড়ির 'ভাগনা দীহির মাঠে', মহাশ্বেতা দেবীর 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮৫), স্বর্ণ মিত্রের 'দামিন-ই-কো' এর ইতিকথা (১৯৭২), তারাশঙ্করের অরণ্য বহ্নি (১৯৬৬), কার্সটেয়ার্স এর "হার্মাজ ভিলেজ" (১৯৩৪), প্রভৃতি সাহিত্য ও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের অজানা কাহিনি খুঁজে পাই।

স্বাধীনতার প্রায় ৭৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও সাঁওতালরা আজও ততটা ইতিহাসের আলোয় আলোকিত হয়নি। ওরাওঁ-রা যেমন টানা ভগৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে

তাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম করেছিল, অনুরূপভাবে ১৮৫৫-৫৬ সালে সংগঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তীকালে সাঁওতালরা খেরওয়ার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই তিলক মাঝি থেকে শুরু করে সিধু, কানু, ভগীরথ মাঝি, দুবিয়া গোঁসাই নেতৃত্ব দানে ইংরেজ দিকু, জমিদার, মহাজন, প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল এটাকেই ঝাড়খন্ড আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে।[৪৮] তবে একটি লজ্জাকর বিষয় এই যে সিধু কানুর ষষ্ঠ প্রজন্মের বংশধর রামেশ্বর মুর্মুকে দুষ্কৃতীরা হত্যা করেছে। সেই হত্যাকাণ্ডের লীলাক্ষেত্রে ছিল ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনী বিধানসভার বড়হট। অথচ এই নির্বাচনী বিধানসভাটি ছিল ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেনের আওতাধীন। দুষ্কৃতীরা এখনও নাগালের বাইরে। একজন সাঁওতাল উপজাতির মানুষ মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকা সত্ত্বেও বিচারের জন্য সিধু কানুর বংশধরকে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। এমন ঘটনা ইতিহাসে পাতায় অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয়। খেরওয়ার আন্দোলন যদিও পরবর্তীকালে জিতু আন্দোলন নামে পরিচিত লাভ করেছে, তবুও যেকোনো মুহূর্তে এটি আবার নতুন নামে নতুন রুপ ধারণ করতে পারে, কারণ এ আন্দোলন তাদের পরিচয় এবং নৃতাত্ত্বিক স্বকীয়তার প্রশ্নের সাথে জড়িত।

সূত্র নির্দেশ

১. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, ২০১৮, পৃ. ১৮৬

২. টুডু রেস্কা, রামদাস, খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি: সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির আদিগ্রন্থ, আনুবাদ ও সম্পাদনা সুকুমার সিকদার ও সারদা প্রসাদ কিস্কু, কলকাতা, নির্মল বুক এজেন্সি, ২০০৪, পৃ. ১৫

৩. হেমব্রম, পরিমল, অষ্ট্রিক থেকে সাঁওতালী, আদিবাসী জগৎ, শারদীয়া, ১৪১০।

৪. ঘটক, শ্রীকালীপদ, অরণ্যচারী সাঁওতাল ও দামিন-ই-কো, প্রবাসী, প্রবাসী প্রেস, কলকাতা, ৩ য় সংখ্যা, ৬১শ ভাগ, ২য় খণ্ড, পৌষ, ১৩৬৮ পৃ. ৩৫৮

৫. Dalton, E.T, Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta, Asiatic Society, 1872, pp 207-218.

৬. চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ, ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনোত্তর আমলে পূর্ব ভারতের আদিবাসীদের নিয়ে কিছু ভাবনা, নাথ ,রাখালচন্দ্র (সম্পাদিত), উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ. ২৬।

৭. চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস, আদিবাসী আন্দোলন, চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ও চৌধুরী, অনিরুদ্ধ (সম্পাদিত), ভারতের সামাজিক আন্দোলন, কলকাতা, লেভান্ত বুকস্, ২০১৩, পৃ. ১১৪।

৮. সিংহরায়, জ্যোৎস্না, আদিবাসী বিদ্রোহের চরিত্র ও সংগ্রাম পদ্ধতি, দাস, অমল কুমার ও মুখোপাধ্যায়, শংকরানন্দ (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী আন্দোলন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তপসিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ, সাংস্কৃতিক গবেষণাগার, বিশেষ সংখ্যা- ২১, ১৯৭৭, পৃ. ৯৫।

৯. মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয়, (সম্পাদিত), সমাজ - ইতিহাসের ধারায় দক্ষিণ - পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা মিত্রম্, ২০২২, পৃ. ১৮০।

১০. চট্টোপাধ্যায়, রুপশ্রী, জন বিদ্রোহের ইতিহাস: উনিশ ও বিশ শতক, কলকাতা, মিত্রম্, ২০১৮, পৃ. ১৩।

১১. Datta, Kalikinkar, The Santal Insurrection of 1855-1857, Calcutta, Firma KLM-Private Limited, 2001, pp 5-6.

১২. চৌধুরী, অরুণ, সাঁওতাল অভ্যুত্থান ও উপজাতীয়দের সংগ্রাম, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃ. ৭১-৭২।
১৩. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, কলকাতা, বিজয়ন প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ২-৫।
১৪. রায়, সুপ্রকাশ, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ডিএনবিএ ব্রাদার্স, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬৫, পৃ. ৩১০-৩১১।
১৫. কবিরাজ, নরহরি, উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম (১৭৫৭-১৮৫৭), কবিরাজ, নরহরি (সম্পাদিত), অসমাপ্ত বিপ্লব, অপূর্ণ আকাঙ্খা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, কলকাতা, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৭৭, পৃ. ৩৩।
১৬. চন্দ্র, বিপান এবং মুখার্জী, আদিত্য প্রমুখ (সম্পাদিত), ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭, কলকাতা, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৪, পৃ. ২৯।
১৭. চৌধুরী, বিনয়ভূষণ, ধর্ম ও পূর্ব ভারতের কৃষক: ১৮২৪-১৯০০, রায়, অনিরুদ্ধ (সম্পাদিত), ইতিহাস চর্চার ধারা, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃ. ৮৩-২৮১।
১৮. চক্রবর্তী, তিতাস ধর্মান্তরের বিপদ: সাঁওতাল প্রেক্ষাপটে, রায়, অনিরুদ্ধ (সম্পাদিত), ইতিহাস অনুসন্ধান -১৯, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃ. ৬৪৩-৬৪৯।
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর, হায়দ্রাবাদ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট, পৃ. ২০৩।
২০. সেন, সুনীল, ভরতের কৃষক আন্দোলন, কলকাতা, চ্যাটার্জ পাবলিশার, ১৯৯০, পৃ. ১৩।
২১. Guha, Ranjit, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Delhi, oxford university press, 1986, p. 67.
২২. রায়, ভব, সাঁওতাল বিদ্রোহের সমকালীন অর্থনৈতিক পটভূমি, সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫০ বছর, দাস, সুখেন্দু ও রায়, সুপ্রিয়া (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বর্ষ- ৩৮, সংখ্যা -১১, ২০০৫, পৃ. ১৪৫।
২৩. সেন, শুচিব্রত, ভারতের আদিবাসী: সমাজ, পরিবেশ, ও সংগ্রাম, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৫৬।
২৪. সেন, শুচিব্রত, পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট, সমাজ বিজ্ঞান গ্রন্থমালা, দিব্যেন্দু হোতা (সম্পাদিত), কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ১৬।
২৫. সেন, শুচিব্রত, ইতিহাসের আদিবাসী এবং আদিবাসীর ইতিহাস; সাঁওতাল সমাজ সমীক্ষা, রায়, অনিরুদ্ধ (সম্পাদিত), ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৯, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃ. ৬৭-৭৮।
২৬. চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ, আদিবাসী চেতনা ও সাঁওতাল বিদ্রোহ: সাম্প্রতিক গবেষণা ব্যাখ্যা, নাথ, রাখাল চন্দ্র নাথ (সম্পাদিত), আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলায় কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, মিত্রম্, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৮, পৃ. ২১২।
২৭. Chattopadhyay, Pradip, Redefining Tribal Identity: The Changing Identity of the Santhals of south -West Bengal, Delhi, Primus Books, pp. 74-78.
২৮. Banerjee, Prathama, Politics in Time, 'Primitives' and History writing in Colonial India, Delhi, OUP, 2006.
২৯. সেন, শুচিব্রত, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬): ইতিহাসের এক দিগ্দর্শন, পরাধীন ভারতের বিদ্রোহ, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ সংখ্যা, ২০২১, পৃ. ৬৬-৬৭।
৩০. Sinha, S.P, Conflict and Tension in Tribal Society, New Delhi, Concept Publishing Company, p. 200.
৩১. দাশগুপ্ত, স্বপন, মেদিনীপুরের আদিবাসী রাজনীতি, ১৭৬০-১৯২৪, অনুবাদ রুমা চট্টোপাধ্যায়, বাংলার বহুজাতি: বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ, ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বল (সম্পাদিত), পৃ. ১৭০।
৩২. Chattopadhyay, Pradip, Redefining Tribal Identity : The Changing Identity of

the Santhals of south - West Bengal, Delhi, Primus Books, p. 81-82.
৩৩. টুডু, বুদ্ধেশ্বর, আদিবাসী বিদ্রোহের ইতিহাস, কলকাতা, পুষ্প, ২০০৮, পৃ. ১৯২।
৩৪. চৌধুরী, বিনয়, উপনিবেশিক পূর্বভারতের হিন্দু আদিবাসী সংস্কৃতির সম্পর্ক, চতুরঙ্গ, ১৪০১, বর্ষ-৫৫, পৃ. ১৬৫-১৬৭।
৩৫. দাস, অমলকুমার এবং মুখোপাধ্যায়, শংকরানন্দ, পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তপসিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ, সাংস্কৃতিক গবেষণাগার, কলিকাতা, বিশেষ সংখ্যা ২১, ১৯৭৭, পৃ. ৭৬।
৩৬. Chattopadhyay, Pradip, Redefining Tribal Identity: The Changing Identity of the Santhals of south -West Bengal, Delhi, Primus Books, p. 81-90.
৩৭. সেন, শুচিব্রত, পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট, সমাজ বিজ্ঞান গ্রন্থমালা, দিব্যেন্দু হোতা (সম্পাদিত), কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৭১।
৩৮. সেন, শুচিব্রত ভারতের আদিবাসী: সমাজ, পরিবেশ, ও সংগ্রাম, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১৬০-১৬১।
৩৯. টুডু, বুদ্ধেশ্বর, আদিবাসী বিদ্রোহের ইতিহাস, কলকাতা, পুষ্প, ২০০৮, পৃ. ১২১।
৪০. Sinha, S.P, Conflict and Tension in Tribal Society, New Delhi, Concept Publishing Company, p. 205.
৪১. Chaudhuri, Tripti, Evangelical or Imperial? Re-examining The Missionary Agenda among the Santhals, 1855-1885, Narratives From The Margins: Aspects of Adibasi History in India, Sanjukta Dasgupta, and Rajsekhar Basu (Edited), New Delhi, Primus Books, 2012, pp. 109-111.
৪২. টুডু, বুদ্ধেশ্বর, আদিবাসী বিদ্রোহের ইতিহাস, কলকাতা, পুষ্প, ২০০৮, পৃ. ১২১-১২২।
৪৩. তদেব, পৃ. ১২২-১২৩।
৪৪. Sinha, S.P. Conflict and Tension in Tribal Society, New Delhi, Concept Publishing Company, p. 213, 216.
৪৫. চৌধুরী, বিনয়ভূষণ, ধর্ম ও পূর্ব ভারতের কৃষক: ১৮২৪-১৯০০, রায়, অনিরুদ্ধ (সম্পাদিত), ইতিহাস চর্চার ধারা, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃ. ১৯৬।
৪৬. চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ, ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনোত্তর আমলে পূর্ব ভারতের আদিবাসীদের নিয়ে কিছু ভাবনা, নাথ, রাখালচন্দ্র (সম্পাদিত), উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ. ৩১।
৪৭. সরকার, সুমিত, আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭), কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৩, পৃ. ৩৭-৩৮।
৪৮. মাহাত, পশুপতি প্রসাদ ও বসু, সজল, ঝাড়খণ্ড: সমাজ ও বিদ্রোহ- আন্দোলন, কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০২০, পৃ. ১৬১।

 ISSN-2319-8591

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ভাবনা- একটি পর্যালোচনা

হেমেন্দ্র নাথ মণ্ডল
পি এইচ ডি, গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

ঊনবিংশ শতকের সূচনায় কলকাতা শহরের দক্ষিণে চাংড়িপোতা, রাজপুর, হরিনাভি, বোড়াল, মাহীনগর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রসিদ্ধ বিদ্বৎসমাজ গড়ে উঠেছিল। পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যতিক্রমী চরিত্র। তাঁর দীর্ঘ সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদনা জীবন ও সাহিত্য রচনাতে কখনো ফুটে উঠেছিল সাহিত্যবোধ, শিল্পচেতনা, সমাজভাবনা, অর্থনৈতিক ভাবনা, রাজনৈতিক চেতনা, মানবিকতাবোধ সংস্কৃতি চেতনা ও স্বতন্ত্র শিল্পভাবনা যা ঊনবিংশ শতকের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচ্য। বর্তমানে আলোচনায় পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন, সমাজ ভাবনা ও রাজনৈতিক ভাবনাকে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

সূচক শব্দ: জন্ম, শিক্ষা ও কর্মজীবন, সোমপ্রকাশ, সমাজভাবনা, অর্থনৈতিক ভাবনা, রাজনৈতিক ভাবনা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিব: সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"[১]

(রাজা প্রজা হিতে রত থাকুন, শ্রুতিমহতী সরস্বতী যেন পরিত্যক্ত না হন।)

সোমপ্রকাশের কণ্ঠে উৎকলিত হত কলিটি। 'সাধারণের হিত' ও 'জ্ঞান চর্চা' এই দুই আদর্শে নিবেদিত ছিল এই পত্রিকা। সম্পাদক দক্ষিণবঙ্গের এক কৃতি সন্তান, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-৮৬) অধ্যাপকজীবনে অজস্র ছাত্রের একনিষ্ঠভাবে শিক্ষাদান করে শিক্ষার জগতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দিক নির্দেশক ধ্রুবতারা। সোমপ্রকাশের (১৮৫৮) সম্পাদক হিসাবে তিনি ছিলেন সংবাদপত্র জগতে নতুন পথের দিশারী। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থে লিখেছেন, "তিনি অধ্যাপকতাবাদে গভীর যে কিছু অবসরকাল পাইতেন, তাহা সমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে একাগ্রতা- লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্তব্যপরায়ণ মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যখন সংস্কৃত ও কলেজের পুস্তকালয়ে পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত না যে অধ্যাপকতা কার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা ভিন্ন তাঁহার পৃথিবীতে আর কোনও কাজ আছে। আবার যখন গৃহে সোমপ্রকাশের জন্য রাশীকৃত দেশী ও বিলাতী সংবাদ পত্র, গবর্নমেন্টের রিপোর্ট ও গ্রন্থাদিপাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন কোথা দিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা যাইত তাঁহার জ্ঞান থাকিত না।"[২]

ঊনবিংশ শতাব্দি সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও

রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন এক সন্ধিক্ষণ যা সমগ্র শতাব্দী জুড়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত বহু নিত্য-নতুন ঘটনা, ভাঙাগড়া, উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে নতুন সৃষ্টির বার্তাকে স্বাগত জানিয়েছে। একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর (১৭৯৩) প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলার তথা ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ যখন জর্জরিত; যার মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন এবং ১৭৭০ - ১৮০০ খ্রীঃ মধ্যে কলকাতা ও তাঁর সন্নিহিত অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে অন্ততঃ চল্লিশটি ছাপাখানা ও বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র। ১৮০৩ খ্রীঃ রামমোহন রায় রচনা করলেন তাঁর প্রখ্যাত 'তুহফৎ-উল-মুয়াহিদ্দিন বা একেশ্বরবাদী দেব প্রতি নামক পুস্তিকা, যার মধ্য দিয়ে তিনি বহুদেবতাবাদ, পৌত্তলিকতা, অলৌকিকত্ব ও অবতারবাদের ধারণার বশবর্তী রক্ষণশীল সমাজকে আঘাত হেনে প্রতিষ্ঠা করলেন' আত্মীয় সভা (১৮১৫)। স্থাপিত হলো হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) ও কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৮)। পাশাপাশি সতীদাহের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে রামমোহন রায় প্রকাশ করলেন, 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ' (১৮১৮ খ্রীঃ), মিশনারীদের খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রসার ও ঔপনিবেশিক সরকারের করাল দৃষ্টি থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে রামমোহন প্রতিষ্ঠা করলেন বেদান্ত নির্ভর ব্রাহ্মসভা (১৮২৮ খ্রী) যা ১৮৩০ খ্রীঃ ব্রাহ্ম সমাজে রূপান্তরিত হলো এবং বাংলা ভাষায় সংবাদ কৌমুদী (১৮২১ খ্রীঃ), ফার্সীতে 'মিরাৎ-উল-আকবর' (১৮২২) শীর্ষক সংবাদ প্রকাশনার পাশাপাশি ১৮২৩ খ্রীঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি সুপ্রিমকোর্টে ও ইংল্যান্ডে সপরিষদ রাজার কাছে স্মারক লিপির মাধ্যমে জোর প্রতিবাদ জানালেন। পাশাপাশি হিন্দু কলেজের ২৩ বছর বয়স্ক তরুণ শিক্ষক, হেনরি-লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯ - ২১) উত্থানে রক্ষণশীলতাকে চ্যালেঞ্জ করে সত্যনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী, আদর্শবাদী শিক্ষকের মাধ্যমে লক, হিউম, বেকন, বেন্থাম, বার্কলে, রীড, টম পেইন, রুশো, ভলতেয়ার প্রভৃতি দার্শনিকদের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছাত্র সমাজকে কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। প্রতিষ্ঠা পায় অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন (১৮২৭ খ্রীঃ) মধ্যে চলত স্বাধীন চিন্তার ও যুক্তিবাদের বিতর্ক সভা। যার থেকে নিষ্কৃতি পায়নি সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্ম। প্রকাশিত হলে পার্থেনন পত্রিকা ও সতীদাহ নিবারণ (১৮২৯) যেখানে স্ত্রীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক প্রবন্ধ। রামমোহনের প্রয়ান (১৮৩৩), কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮৩৫), তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), অক্ষয়কুমার দত্তের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩), বিধবা বিবাহ আইন আরোপ (১৮৫৬), কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে (১৮৫৭) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি ও ধর্ম ও রাজনীতি জীবনের নবসঞ্চার ঘটেছিল বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে।[৩] দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এ হেন আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলে বড় হয়ে ওঠা। ফলে জীবনের বহু অভিজ্ঞতা ও সমকালীন সমাজের বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে এসে সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদনার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পরা।

প্রচলিত যুগধর্ম অনুযায়ী বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রামীন পরিবেশে গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় ভাষা, ব্যাকরণের ও গণিতের পাঠ নিতে শুরু করলেন। গ্রামের পড়াশোনা শেষ করার আগেই ভালো শিক্ষার ত্যাগিদে বালক বিদ্যাসাগর দারিদ্র পিতার হাত ধরে চেনা গ্রাম-গঞ্জ, খানা-খন্দ, মাঠ-ঘাট পেরিয়ে পায়ে হেঁটে কলকাতায়

চলে আসা। পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিশেষত হিন্দু কলেজে শিক্ষা না পেলে সেদিন মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবন বৃথা। দরিদ্র পিতার সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে ভর্তি হতে পারলেন না। কারণ সেখানে বেতন দিয়ে পড়তে হয়। পাশে আছে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪) যেখানে পড়তে বেতন লাগে না। ১৮২৮ সালে মাত্র ন'বছর বয়সে তিনি ভর্তি হলেন সংস্কৃত কলেজে (১৮২৯-৩৯) এবং বারো বৎসর বয়সে ভর্তি হলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় (১৮৩২)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পন্ডিত বিদ্যাসাগরের থেকে বয়সে মাত্র এক বছরের বড়ো ছিলেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পৈত্রিক গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পিছনে দারিদ্র নয় বরং মধ্যবিত্ত পারিবারিক ঐতিহ্য ও রাজপুর-হরিনাভি-চাংড়িপোতার পরিবেশ তাঁকে সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহিত করেছে। এভাবে বাঙালি জীবনের এক নতুন গতিপথ নির্মিত হয়ে গেল। প্রসঙ্গত চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' জীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু বৎসল ছিলেন এবং বিদ্যাভূষণের নিজ যোগ্যতা ও গুণের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহভাজন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপযুক্ত সম্মান দেন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনাতে সুযোগ করে দেওয়ার। যার কৃতজ্ঞতাবোধে স্নাত বিদ্যাভূষণ মহাশয় সমগ্র জীবন বয়ে বেড়ায়।

জন্ম ও পরিচয় : ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত চাঙ্গড়িপোতা জন্ম গ্রামে দ্বারকানাথের জন্ম। পিতা স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক পণ্ডিত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি ছিলেন তেজস্বী ও উন্নতশির, পিতা ও পন্ডিত সর্ব্বানন্দ সার্বভৌমের কাছে শুরু হয় প্রাথমিক পড়াশোনা, ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা করেন। ব্যাকরণ, বেলিস লেটার, গণিত, তর্কশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, আইন ও ইংরাজী। কলেজের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম ও প্রধান বৃত্তি পেয়ে লাভ করেন বিদ্যাভূষণ উপাধি।[৪]

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলেজে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা শিক্ষকের পদ দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ, ব্যাকরণ শিক্ষক ও সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যাপক পদে রত হন সংস্কৃত কলেজে। কর্মজীবনের মোট সময়সীমাছিল ১৮ বৎসর ৭ মাস। সাহিত্য সৃষ্টিতেও দ্বারকানাথ ছিলেন বিশেষভাবে তৎপর। তাঁর প্রধান সাহিত্যকীর্তি সোমপ্রকাশ (১৮৫৮) কল্পদ্রুম (১৮৭৮) নামে উচ্চ-শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। ছাত্রদের প্রয়োজনে লেখেন রোমের ইতিহাস (১৮৫৭), গ্রীসের ইতিহাস (১৮৫৭), সুবুদ্ধি ব্যবহার (১৮৬০), ভূষণসার ব্যাকরণ(১৮৬৫), বিশ্বেশ্বর বিলাপ (১৮৭৪), উপদেশমালা (১৮৮৩), সাংখ্য দর্শন (১৮৮৬), এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয় - দেবগণের মর্ত্যে আগমন (১৮৮৬)। সাধারণ মানুষের হিতসাধনায় উন্মুখ দ্বারকানাথ তাঁর হরিনাভি গ্রামে তৈরি করেছিলেন উচ্চতর ইংরাজী বিদ্যালয়। বহু প্রতিভাবান ছাত্র এখানে পড়াশোনা করেন। তাঁর উদ্যোগ তৈরি হয় রাজপুর ডাকঘর, রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি (১৮৭৩), চাঙ্গড়িপোতা রেলওয়ে স্টেশন। দরিদ্র ও নিরন্ন মানুষদের বিভিন্ন চাকরিতে বহাল করতেন। বিভিন্ন মানবিকগুণে ভূষিত ছিলেন বিদ্যাভূষণ। মিতব্যয়িতা, অধ্যাবসায়, পরিশ্রম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর সাফল্যের অন্যতম স্তম্ভ। স্বদেশের উন্নতিসাধন ও সমাজ সংস্কারে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

এমনকি মৃত্যুর পূর্বে দেশের উন্নতির কথা প্রলাপ বকতে বকতে তাঁর মৃত্যু হয় (১৮৮৬)।

সোমপ্রকাশ : শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সারদাপ্রসাদ নামে এক বধির ছাত্রের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সোমপ্রকাশ প্রকাশনার উদ্যোগ নেন। সারদাপ্রসাদ বর্ধমান মহারাজার অধীনে বর্ধমানে চাকুরী পেলে সে উদ্যোগ স্তিমিত হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলা সংবাদপত্র জগতে ভালো সংবাদপত্রের অভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও অন্যান্য পন্ডিতদের কাছে এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) প্রথম প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। প্রথমে প্রতি সোমবার চাপাতলা আমহার্স্ট স্ট্রিট সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের ১নং বাড়ি থেকে শ্রী গোবিন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় প্রকাশ করতেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে দক্ষিণপূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর স্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের গৃহ থেকেই প্রকাশিত হত সোমপ্রকাশ। সোমপ্রকাশের মাসিক মূল্য ১ টাকা, বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫ টাকা। ছাত্রদের জন্য মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল ডাকমাসুল সহ বার্ষিক ৩ টাকা, অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য ৭ টাকা। ১৮৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী থেকে কিছুদিনের জন্য দ্বারকানাথ সম্পাদকীয় পদ থেকে সরে আসেন। পত্রিকা সম্পাদনার ভার নেন মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। আবার ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাভূষণ স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কাশী গেলে পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়ে তাঁর ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর উপরে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের 'ভার্নাকুলার আইনে' এই পত্রিকার প্রকাশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই আইন রদ হলে পুনরায় প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট বিদ্যাভূষণ লোকান্তরিত হবার পরেও এই পত্রিকা আরো কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল।[৫]

সোমপ্রকাশের বিশেষত্ব : উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে জাতীয় জীবন আন্দোলিত হয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা পরিবর্তনশীল পটভূমিকার সৃষ্টি করে। এই পরিবর্তনশীল পটভূমিকায় সোমপ্রকাশ হয় দিক-দিশারী। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষের ভাষায়, 'সোমপ্রকাশ' উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষিত উদারপন্থী বাঙালী মধ্যবিত্তের অন্যতম মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল।তার কারণহিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন, "সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে 'সোমপ্রকাশ' যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তার সুর ও ভাষা পূর্বেকার ধারা থেকে স্বতন্ত্র। রাজনৈতিক মতামত সেকালের তুলনায় অনেকটা নির্ভীক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতামত নিঃসন্দেহে উদার।"[৬]

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি তর্পণ করেছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এডুকেশন গেজেট (১৯ ভাদ্র ১২৯৩)। এই স্মৃতি তর্পণেই পরিস্ফুট হয় সোমপ্রকাশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।"বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঙ্গলা সংবাদপত্রের প্রথম শিক্ষাগুরু। তাঁহা হইতেই বাঙ্গলা সংবাদপত্রের উন্নতি হয়। পূর্বে ভাস্কর, প্রভাকর, সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদপত্র ছিল বটে, কিন্তু সংবাদপত্রের উপযুক্ত বিষয় সমূহ এই সকল পত্রে লিখিত হইত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সুপদ্ধতিতে বাঙ্গালা সংবাদপত্র পরিচালনের

প্রকৃত পথ নিদর্শন করেন। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলন কিরূপে করিতে হয়, তিনি প্রথম তাহা বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে দেখাইয়া দেন। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রই যে এ উন্নতির মূল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।"[৭]

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ'-এ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর মতামত বিজ্ঞাপিত করেছেন, "যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমন মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমন নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূলে ছিল।"[৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'তে সোমপ্রকাশের সম্পাদকের কৃতিত্বের মূল্যায়নের সাথে সাথে সোমপ্রকাশের স্বাতন্ত্র্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। "ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বাংলা দেশের সংবাদপত্র জগতে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। ততদিন পর্য্যন্ত বাংলা সংবাদপত্রে নিষ্ঠা, শুচিতা ও প্রাঞ্জলতার অভাব ছিল। পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও সাধনায় মূলত এই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বাংলা সংবাদপত্রকে নির্ভরযোগ্য রাজনীতির ও সমাজ সংস্কারনীতির বাহন করিয়া তিনি বাংলাদেশের জনসাধারণের চেতনা ঐ সকল বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অসাধারণ পান্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন সংবাদপত্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম, কুৎসিৎ দলাদলি ও পরস্পর কর্দ্দম নিক্ষেপকে বিষবৎ বর্জন করিয়াছিলেন। শুভ্র শুচিতামন্ডিত হইয়া তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা অচিরাৎ বাংলাদেশে আদর্শ সংবাদপত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐপত্রে সাহিত্য সমালোচনাগুলিরও বৈশিষ্ট্য ছিল। সোমপ্রকাশের নামের সহিত জড়িত হইয়া পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম বাংলাসাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া আছে।"[৯] সুতরাং ভাষার প্রাঞ্জলতা, মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, বিষয়-বৈচিত্র্য ও সংবাদ প্রকাশের নির্ভীকতা সোমপ্রকাশকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিল।

সামাজিক ভাবনা : অত্যন্ত বিচারশীল ও মুক্ত মন নিয়ে সামাজিক সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছিল সোমপ্রকাশে। ব্রাহ্মসমাজ, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উপায়, মুসলমান দিগের কুসংস্কার, বহুবিবাহ, স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা প্রদান, সন্তান বিক্রয়, বিহারে বাঙালীর একাধিপত্য, হিন্দুসমাজ ও ধর্মসংস্কার, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, কন্যাপণ, কৈলিন্যপ্রথা, ভারতবাসীর বিলাত যাত্রা, আর্যসমাজ, দুর্গাপূজা, প্রভৃতি নানা সামাজিক বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত জানিয়েছিল সোমপ্রকাশ। তবে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক বেশী। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলিতে ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনাই বেশী। "সর্ব্বজাতীয় ও সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণ মধ্যে ভ্রাতৃভাব জন্মে, এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হইয়াছে। এমন মহাপুরুষদিগের স্বার্থপরতা দোষে নূতন নূতন মন উদ্ভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম নামে একটি পৃথক সম্প্রদায় হয় এবং তাহা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈরী স্বরূপ হয়, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কিছুই নাই।"[১০] সমাজের অগ্রগতির জন্য হিন্দু সমাজ ও ধর্মসংস্কারের কথা উক্ত হয়েছিল সোমপ্রকাশে স্ত্রী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশের বক্তব্য কিছুটা রক্ষণশীল। সমাজে স্বাধীনভাবে সর্বত্র চলাফেরাকে

অনিষ্টকর বলে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল সোমপ্রকাশে। দ্বারকানাথ বৈদিক ব্রাহ্মণের কুলপ্রথা অনুসারে পেটে পেটে সম্বন্ধ রোধ করেন।

অর্থনৈতিক ভাবনা : তৎকালীন অর্থনৈতিক সমস্যার অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করে মতামত প্রকাশ করেছিল সোমপ্রকাশ। নীলচাষ, পার্ট ও রেশমচাষ, মজুরশ্রেণী, এদেশীয় জমিদারদের অত্যাচার, প্রজাদের দুরাবস্থা, পাবনার প্রজাবিদ্রোহ, এদেশীয়দের চাকুরিপ্রিয়তা, ইংরাজী মুলধন বিনিয়োগে ভারতের উপকার ও অপকার, দেশীয় শিল্পের অবনতি, বঙ্গে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিষয়ে অমূল্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ অত্যাচারের সহযোগী ছিল এদেশীয় জমিদারগণও। "জমিদারদিগের মধ্যে আর একটি দল আছে হইয়াছে, তাঁহারা বড় পাকা লোক। কুকার্য্য পরিপাক করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাচীন দলের একটি সম্প্রদায় হইতে তাঁহাদিগের এই শিক্ষাটি হইয়াছে। ঐ সম্প্রদায় গোপনে না করেন এমন কুকর্ম্ম নাই, পরদারগমন, উৎকোচগ্রহণ ও কৃতয়তা করিয়া পরের সর্বস্ব হরণ প্রভৃতি কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন। তাঁহাদিগের এইসকল কুক্রিয়া জীর্ণ করিবার মহৌষধ আছে। সেই ঔষধ এই গঙ্গাস্নান ও নামাবলী গ্রহণ।"[১১] ঐ অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য সোমপ্রকাশ দেশের মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর ঐক্যের কথা বলেছিল। সোমপ্রকাশে প্রকাশিত নীল প্রধান প্রদেশ,[১২] এবং আবদুল মতলেব মণ্ডল লিখিত পত্রে নীলচাষীদের করুণ আর্তি পরিস্ফুট হয়েছিল। বাঙালীর বাণিজ্যে অংশগ্রহণের অনীহা যে তার চরিত্রে অন্তলীন তা সোমপ্রকাশ যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ করেছিল।[১৩]। সোমপ্রকাশ এ তত্ত্বও প্রচার করতে ভোলেনি যে শিল্পবিস্তারে এদেশের কল্যাণ নিহিত, তবে সেই শিল্পবিস্তারে ভারতের মঙ্গলের জন্য ভারতীয় মূলধনের বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরী; ব্রিটিশ মূলধন নয়। "ভারতে রেলওয়ের সৃষ্টি হওয়াতে ভারতবাসীর কি কোন সারবৎ লাভ হইয়াছে? ইঁহারা কি কল প্রস্তুত করিতে শিখিলেন? ইহারা স্বাধীনভাবে কোনস্থানে রেলওয়ে করিতে পারিলেন?- ব্যবসায়ে যে কিছু সুবিধা হইয়াছে সেটাও এদেশের পক্ষে সামান্য লাভ।"[১৪]। বিদেশী পণ্যের আগমনে বাঙ্গালার দেশীয় সমৃদ্ধ কুটির শিল্পের দুর্দশার এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় সোমপ্রকাশে প্রকাশিত প্রবন্ধে। ইউরোপীয় বাণিজ্য সংঘর্ষে দেশীয় শিল্পেরও বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।[১৫] বাঙালীর সামাজিক ও চারিত্রিক ত্রুটি সুচারুরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে সুদীর্ঘ ও 'বাঙালীর দারিদ্র্য' প্রবন্ধে।[১৬]

রাজনৈতিক ভাবনা : সোমপ্রকাশে সমকালীন রাজনৈতিক কার্যাবলী প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। নির্ভীকভাবে ব্রিটিশ নীতির সমালোচনা থাকত সোমপ্রকাশের প্রায় সকল সংখ্যাতেই। নিরস্ত্রকরণ ক্রিয়া, আগ্রার দরবার, প্রেস সংক্রান্ত আইন, মিউনিসিপাল সভা, ইলবার্ট বিল, দেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারপতি, জমিদার সভা, বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ, ভারতসভা, জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। অন্যদিকে আলোচিত হয়েছিল, ইংরেজ অধিকারে ভারত সুখী কি অসুখী, 'ব্রিটীশ শাসন প্রণালীর মহাদোষ, 'ভারতবর্ষকে হস্তে রাখিয়া ইংলন্ডের লাভ কি,' 'এদেশীয় দিগের রাজনীতি ঘটিত উন্নতি হইয়াছে কি না?' প্রভৃতি রচনা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষায়

সোমপ্রকাশ ছিল অনলস। মুসলমান সমাজের নানা সমস্যা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হলেও মুসলমান বিদ্বেষ কখনো স্থান পায়নি। জাতীয় সংহতি ছিল এই পত্রিকার কাম্য।[১৭] ১৮৮১ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে 'দেশীয় শান্তিভঙ্গ' নামে যে প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছিল তার অংশবিশেষ উৎকলিত হল. .... "মধ্যে মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দাক্ষিণাত্যে পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান জাতির পরস্পর দারুণ বিবাদ ঘটিতেছে। এই উভয় জাতি বহুকাল অবধি ভারতবর্ষে বাস করিতেছে, তাহারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বটে, কিন্তু একরাজার প্রজা ও একদেশ নিবাসী। অতএব তাহাদের এতাদৃশ বৈরভাবে উদয় হওয়া যারপরনাই আক্ষেপের বিষয়। কেবল হিন্দু ও মুসলমান বলিলেই ভারতবর্ষের সকল ধর্মালম্বীর নাম করা হইল না। হিন্দুগণও অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে একপ্রকার সম্প্রদায়ের মত অন্য সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের মতের সামঞ্জস্য হয় না, বৌদ্ধের সঙ্গে সাধারণ হিন্দুসমাজের মতের মিল নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীরা আবার আর এক সম্প্রদায়ের লোক, ইঁহারা সকলেই যদি বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন, তবে ভারতের উৎসান্নে যাইতে একদিনও লাগে না। ধর্ম্ম-কর্মে সকলে আপন আপন বিশ্বাস মত কাজ করুন। কিন্তু সামাজিক কাজে একতা চাই। নতুবা নিজ নিজ উন্নতিও হইবে না। স্বদেশেরও উন্নতি হইবে না। ব্রিটীশ শাসনের স্বরূপ দর্শাইয়া সোমপ্রকাশ মন্তব্য করে, ইংরাজদিগের রাজ্যের শাসন প্রণালী দর্শন করিলেই হঠাৎ বোধ হইবে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নামগন্ধনাই। কেহ যে ইচ্ছামত কোন অন্যায় বা অত্যাচারের কার্য করিবে সে সম্ভাবনা নাই। গত মন্ত্রীসভা ও বর্তমান মন্ত্রীসভা ও অধীনস্থ প্রদেশ সকলের গত শাসনকর্তা ও বর্তমান শাসন কর্তাদিগের কার্য ও ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা মূর্ত্তিমতি হইয়া যেন বিরাজ করিতেছে। কার্য্য দেখিলে বোধ হয় মুসলমান রাজাদিগের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ছিল কিনা সন্দেহ।"[১৮]। ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদানে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সোমপ্রকাশ নির্ভায় পেশ করেছিল, "তাঁহাদের স্বার্থসাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য, ভারতের শ্রীবৃদ্ধি আনুষঙ্গিক ফল। ভারতের শ্রীবৃদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে কখন ঐ আইনের সৃষ্টি হইত না।"[১৯] ভারতবাসী প্রাচীন শিল্প ও বিজ্ঞান ক্রমে অবলুপ্ত হচ্ছে, ভারতবাসীর উন্নতি ব্যাহত হবার পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল ভারতের পরাধীনতা। স্বদেশী ও বিদেশীয় রাজার অধিকার [২০] প্রবন্ধে সোম প্রকাশ মন্তব্য করেছিল, ("পরাধীনতা যে উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক এবং পরাধীনতা হইতে পূর্ব্ব উন্নতির যে লোপ হয়, তাহা ইংরেজ অধিকারে বিলক্ষণ সম্প্রমান হইতেছে। ইংরেজেরা এদেশীয়দিগকে নানাবিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহাদিগের উন্নতি লাভের পথ সুন্দররূপে পরিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন না।" বাঙালীর বিলাসী চরিত্র সমালোচিত হয়েছে সোমপ্রকাশে। "বঙ্গদেশের এই স্ত্রৈন্যভাব দূরীভূত হইয়া যে কবে পুরুষভাব হইবে আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি।" সুতরাং রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে সোমপ্রকাশ ছিল অকুতোভয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে নীতি শিক্ষামূলক বই লিখে বাংলা সাহিত্যের আকাশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক ঝাঁক মনীষীর। তাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আছেন ইউলিয়ম কেরী, মার্শম্যান, জেমস লঙের মতো বিদেশীরাও।

সেই ধারায় স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়ে দিয়ে পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ছাত্রদের প্রয়োজনে লিখেছিলেন একের পর এক সাহিত্য গুণসম্পন্ন গ্রন্থ। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের জগতে নিজের জায়গাকে কঠিন ভিতের উপরে দাড় করিয়েছিলেন। তার রচিতগ্রন্থের মধ্যে নীতিসার (তিন খন্ড, ১৮৫৬, ১৮৫৬, ১৮৭৮) রোম রাজ্যের ইতিহাস (১৮৫৭), গ্রীস দেশর ইতিহাস (১৮৫৭), সোমপ্রকাশ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা, সুবুদ্ধি ব্যবহার (১৮৬০) ভূষণসার ব্যাকরণ, পাঠামৃত (১৮৬৫), বামদেব ও যোগিনী উপন্যাস, ছাত্রবোধ, উপদেশমালা (দুই খন্ড), সংখ্যাদর্শনের অনুবাদ, একাদশ অবতার প্রহসন, দেবতাগণের মর্তে আগমন, কবিতার মধ্যে বিশ্বেশ্বর বিলাপ (১৮৭৪) প্রকৃতি প্রেম, প্রকৃত সুখ, মনুসংহিতার অনুবাদ এবং কল্পদ্রুম পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও নানা প্রবন্ধ রচনা করেন। (যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সম্পদ হিসাবে বিবেচ্য) যার বিষয় তৎকালীন সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা হলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনালোচিত অধ্যায় হিসাবে রয়ে গেছে।[২১]

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাথমিক ভাবে ঔপনিবেশিক সরকার ও দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বোঝাপড়াকে কেন্দ্র করে যে যোগসূত্রতা তা ভাঙতে চান নি। জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির পূর্বে কংগ্রেসের যে আবেদন নিবেদন নীতিকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। তিনি চাইতেন আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নিয়ম মেনে দেশীয় জনগণের আইনি অধিকারগুলি তুলে ধরতে। প্রয়োজনে কঠিনভাবে তিরস্কার করতেও তিনি ছাড়েননি তার সম্পাদিত পত্রিকার পাতায়। ফলতঃ ঔপনিবেশিক সরকারের প্রত্যেকটি নিয়ম নীতিকে সমালোচনা করতে তিনি কখনই পিছু হটে আসেন নি। তিনি যেমন সমালোচনার মাধ্যমে কঠিন প্রশ্নের সামনে উপস্থিত করেছিলেন, তেমনি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত উপদেশ সমগ্র ঊনিশ শতকের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।[২২] তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, ইংল্যান্ডের মতোই ভারতে 'মিশ্র সংবিধান' (Mixed Constitution) প্রচলন হোক। কারণ এই 'মিশ্র সংবিধানে' ভারতবাসীর বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করে। এই মিশ্র সংবিধান তখনই সফল হবে যখন আদর্শ দেশীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে ভারতবর্ষ শাসিত হবে। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় আইন পরিষদের অনুমতি ব্যতীত গভর্নর জেনারেল জনবিরোধী কোন বিলকে আইনে পরিণত করতে পারে না। ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণের দ্বারা কেউ কারুর উপর প্রভাব খাটাতে পারে না। ফলতঃ জনগণের বেশিরভাগ মানুষের শাসনের নিষ্ঠুর শোষণ থেকে মুক্ত হতে পারে। গভর্নর জেনারেলের সম্মতি ব্যতিরেকে আইন পরিষদ কোন অগণতান্ত্রিক নীতি, অতিরিক্ত কর ধার্য্য, ব্যয় নির্ধারণ করতে পারে না। জনগণের স্বার্থে উভয়েই সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। তিনি ব্রিটিশ শাসকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের কর্মপদ্ধতি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। যেমনটা কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদ করেছিল ঠিক তেমনি তিনি তার মুখপত্রে প্রতিবাদ জানান। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় জনগণের ব্যয়ে পরিচালিত দুই-তিন জন প্রতিনিধি বিদেশে পাঠানো হলেও তাদের হয়ে বলার কেউ ছিল না। ফলতঃ ঔপনিবেশিক সরকার নিজেদের সুবিধা মতো আইন তারা আইনসভায় পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই

নীতির বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইডেন, আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল ও ইতালির অনুকরণে যেমন নির্মিত হয়েছিল ব্রিটিশ সংবিধান। তেমনি তিনি সব দেশের শাসন ব্যবস্থার যা কিছু জনগণের মঙ্গল ও কল্যাণকর সেই সমস্ত বিধিগুলি নিয়ে ভারতে মিশ্র সংবিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন।[২৩]

এখন প্রশ্ন হল, তাঁর মধ্যে এই দৃঢ় রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণ কি? প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ইতিহাস চর্চা করতে গিয়েই তাঁর চিন্তার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। যা তার সম্পাদিত সোমপ্রকাশ পত্রিকার পাতায় জোড়ালো ভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর চিন্তা চেতনাতে উদারনীতিবাদ (Liberalism) এর প্রচ্ছন্ন প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।[২৪]

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ আঞ্চলিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির পরিবর্তে ভারতবর্ষের ঐক্যবদ্ধ শাসন ব্যবস্থাকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাছাড়া ভারতবাসীর সামাজিক জীবনের উপর ব্রিটিশ সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপকে তিনি মেনে নিতে পারন নি। আইন, বিচার ও শাসন বিভাগ নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগে তিনি যেমন সমর্থন করতেন, তেমনি ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্য, রেলপথ নির্মাণ, জলসেচ, খাল খনন প্রভৃতি কার্যের উপর ব্রিটিশ সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপকে তিনি গভীর নিন্দা করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও যৌথ কারবারকে স্বাগত জানাতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি চাইতেন ঔপনিবেশিক সরকার জনগণের সমর্থন নিয়েই সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দিক। পনপ্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রথা যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর তা আইন দ্বারা বন্ধ করতে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করেছিলেন। পাশাপাশি সমাজে কুসংস্কারকে দূর করতে সরকারের জনশিক্ষা প্রসার নীতিকে প্রতিফলিত করতে ব্যক্তিগতভাবে তার উদ্যোগকে চোখে পরার মতো। তাছাড়া ঔপনিবেশিক শাসনের কঠিন বলপ্রয়োগ নীতিকে তিনি তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছিলেন তার ব্যক্তিগত সম্পাদকীয় কলমে। জনশিক্ষা নীতির মূখ্য প্রবক্তা হিসাবে তিনি স্বল্প সংখ্যক অভিজাত জমিদার, ধনী শ্রেণীর পরিবর্তে সরকারীয় অর্থ যাতে সর্বসাধারণ জনগণের জন্য ব্যয় করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ সরকার যদি দরিদ্র সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষানীতি চালু করেন তাহলে উচ্চবিত্ত, ধনী মানুষ যারা সমাজের কর্ণধার, তাদের গর্ব কিছুটা হ্রাস পাবে। তিনি সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি শারীরবৃত্তিয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তিনি পুরানো নীতিকথায় দৃঢ় বিশ্বাস করতেন যার জন্য তার 'নীতিসার' (৩য় খন্ড) রচনা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন- "Without a sound mind in a sound body no young man could make himself a useful citizen". তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল স্বনির্ভরতা, আত্মনির্ভরতার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার, যার মধ্য দিয়েই জনগণ নিজের সার্বিক উন্নতি সাধনে সক্ষম হবে। যার উদাহরণ হিসাবে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্কুল, রাস্তা, রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ, পোস্ট অফিস, রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি নির্মাণ করেছিলেন যার প্রভাব বর্তমানে অনুধাবন যোগ্য। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কার্যকলাপ ও লেখনীর দ্বারা যেভাবে দেশবাসীকে গভীর ভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।[২৫]

তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য রচনা ও সোমপ্রকাশ পত্রিকার লেখনীতে সমকালীন রাজনৈতিক

অবস্থার বাস্তব বিবরণ যুক্তিযুক্ত ও মনোগ্রাহী বর্ণনা যা দরিদ্র সাধারণ বাঙালি তথা ভারতবাসীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। যার অবসম্ভাবী পরিনতিতে ১৮৮৫ সালের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন[২৬]।

অক্ষয় কুমর দত্ত, শিশির কুমার ঘোষ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর মতো তিনি ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক সাজা সংক্রান্ত নীতির উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিচারের শেষ কথা ফাঁসি নয়, তার সাজা স্বরূপ তাকে দিয়ে যদি কৃষিকাজ করানো যেত, তাহলে সামাজিক মানুষ হিসাবে ফিরে আসার তার কাছে একটা সুযোগ থাকত এবং সামাজিক উৎপাদনের গতিকে মসৃন করতে নিজেকে সর্বত্রভাবে সামিল করতে পারত। সরকারকে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ জানান।[২৭] তিনি জুরিনীতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কারণ এর দ্বারা অনেকগুলি বিচারপতির দ্বারা বিচারকার্য সম্পন্ন হওয়ায় সুষ্ঠ বিচারের সম্ভাবনা থাকে।[২৮] অক্ষয় কুমার দত্তের মতো ঔপনিবেশিক সরকারের দ্বীপান্তর নীতিকে কঠিন সমালোচনা করেন।[২৯] তার সম্পাদিত সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদপত্রকে প্রশংসা করতে গিয়ে বিপিন চন্দ্র পালের ভাষায় সোমপ্রকাশ ছিল- "A professional political newspaper and it was always been absolutely out spoken in its citizen of public politics and measures"। দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁর ভারতসভাতে ব্রিটিশ সরকারকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন।[৩০]

উদারনীতিবাদের অন্যতম মুখ্য প্রবক্তা হিসাবে রামমোহন রায়ের সঙ্গে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কিছুটা মিল পাওয়া যায়। ১৮১৫ সালের রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তাকে তিনি ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কখনো সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বীকৃতির দাবিতে সোচ্চার, কখনো নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা, আবার কখনো তিনি বাংলা গদ্য, পদ্য, বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের সেবকরূপে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন। পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য সবার জন্য সবার জন্য শিক্ষার দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন সোমপ্রকাশের পাতায়। আসলে তিনি এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করেছিলেন যখন পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধীনতাকে ফিরে পাবার কোনরকম প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যায় নি। ফলতঃ সমগ্র শিক্ষিত হিন্দু সমাজ চরম হতাশার মধ্যে পরেছিল। অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ছায়া গ্রাস করেছিল গ্রাম সমাজকে। আর এই সর্বব্যাপী মানসিক জড়তার পরিমন্ডল দোর্দন্ডপ্রতাপ পুরোহিততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র ধর্মের স্থান দখল করেছিল লোকাচার। বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে এসেই বিদ্যাভূষণ মহাশয় সমাজসংস্কার ও সোমপ্রকাশের সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে নিজস্ব লেখার হাতকে কিছুটা সরোবরো করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সোমপ্রকাশ, কল্পদ্রুম পত্রিকার সম্পাদনা ও সম্পাদকীয় কলমে অজস্র লেখা ও নিজস্ব সাহিত্য চর্চার মধ্যে দিয়ে সমকালীন সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রদর্শনের চিন্তার ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। যার সঙ্গে উদারনীতিবাদের সঙ্গে বহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উদারনীতিবাদের গোড়ার কথা হল স্বাধীনতা (Liberty)। তাঁর এই স্বাধীনতাবোধই সারাজীবন তাঁকে গভীরভাবে ভাবিত করেছিল। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপনিবেশিক

সরকারের গৃহীত সমস্ত নীতিগুলিকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি তাঁর সোমপ্রকাশের পাতায়। তিনি সমকালীন বিশ্বের সমস্ত ঘটনা, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার ক্রীতদাস নীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালির ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন, আয়ারল্যান্ডের কৃষক সংগ্রাম, আবিসিনিয়ার আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতার ধারণাকে তিনি ভারতবাসীর কাছে সোমপ্রকাশের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থনও করেছিলেন। বিশ্বজুড়ে যে স্বৈরাচারী শাসনের যে উপদ্রব চলেছিল তা রোধ করতে শুধু পার্লামেন্ট দখলের দাবীকে নাকচ করে সহজাত স্বাধীনতাবোধ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন। উদারনীতিবাদ রাজনৈতিক দর্শনে স্বাধীনতা সংরক্ষণের সঙ্গে সংবিধান-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর রাষ্ট্রক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণের উপায় হল জনগণকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা। সেই কাজই তিনি সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় কলম সহ পত্রিকায় অন্যান্য লেখার সম্পাদনার মধ্য দিয়েই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। উদারনীতিবাদের স্বীকৃত আরো একটি মৌলিক অধিকার হল, বাক-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার। যার জন্যই তিনি পত্রিকা সম্পাদনার কথা ভেবেছিলেন সারাজীবনই এই মহান ব্রত পালনও করে গেছিলেন। ফলতঃ ব্রিটিশ বিরোধী লেখা প্রকাশিত হবর জন্যই ১৮৭৮ সালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের কবলে পরে সোমপ্রকাশ পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ হলেও তিনি থেকে থাকেননি। জীবনের শেষদিন পর্যন্তই কল্পদ্রুম শীর্ষক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করে গেছিলেন। তিনি মনে করতেন, উদারনীতিবাদকে সফল করতে অবশ্যই প্রয়োজন, আইনের শাসন। জনগণের অধিকারকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন সাধারণ ও নিরপেক্ষ আইনি ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক শাসনে অত্যাচারিত, নিপীড়িত ভারতবাসী যাতে তাদের উপযুক্ত। আইনি অধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্য তিনি সরকারের একপেশে বিচারনীতিকে সমালোচনা করেছিলেন। আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা একই ব্যক্তির হাতে থাকাকে সমর্থন করেন নি। তাছাড়া ভারত শাসনের জন্য এদেশে আলাদা আইন সভা স্থাপনের বিরোধিতা করেন। কারণ তার ব্যয় ভারতীয়দের উপর বর্তাবে। তিনি বুঝেছিলেন আলাদা আইনসভা স্থাপিত হলে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিল তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে; ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি লঙ্ঘিত হবে এবং ভারতে আবার সেই স্বৈরাচারী শাসন ফিরে আসবে। তাছাড়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সদস্যদের নিরপেক্ষতা ও প্রজাহিতৈষণা সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি তা হতে বৃহৎ ভারতবাসীকে বঞ্চিত করতে চান নি। রামমোহনের মতই দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বিচার ব্যবস্থাকে দুর্নীতা, মন্থরতা ও ব্যয়বাহুল্যের কবল থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করবার জন্য তিনি জনগণের দ্বারা বিচারের তত্ত্বাবধানের গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। ভারতবর্ষের জুরী প্রথা প্রবর্তনকে সমর্থন করতেন। এমনকি বিচারের সাজা হিসাবে ফাঁসি দানকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি মনে করতেন ফাঁসি দেওয়ার থেকে যাকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে, তাঁকে দিয়ে যদি কৃষিজ উৎপাদন করায় তাহলে দেশের উন্নতি

হবে। সেই সঙ্গে তাঁর সংশোধনের বিকল্প রাস্তা নির্মিত হতে পারে বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আইনের অনুশাসনের সঙ্গে সঙ্গে সুবিচারের প্রসঙ্গটি জড়িত। সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য যাতে সুবিচার প্রার্থী হয়ে সুখে, স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধির অর্জনের চেষ্টা করতে পারে তার জন্য দ্বারকানাথ কৃষক সমাজ যাতে সঠিক প্রাপ্য পেতে পারে অর্থাৎ প্রজাস্বত্ব হিসাবে ভূমির উপর আইনি অধিকারকে ফিরে পাবার আবেদন করেছিলেন সোমপ্রকাশে। তাছাড়া লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) সমালোচনা করে বলেন, সরকার ও জমিদারের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদিত হলেও জমিদার ও কৃষকের মধ্যে কোন বন্দোবস্ত হয় নি। জমিদারের দেয় রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে তারাও ঐ নির্দিষ্ট অর্থের চুক্তিতে ইজারা, দরইজারাদার, পত্তনিদার, প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীরা দরিদ্র কৃষকের উপর অত্যাচার করতে থাকেন। কৃষকের সঙ্গে উৎপাদনের যে সম্পর্ককে তারা অস্বীকার করে নিত্য নতুন অতিরিক্ত কর ধার্য্য করতেন ফলতঃ অত্যাচারিত কৃষকগণ জমি থেকে পালিয়ে বাঁচত। এই হেন নিষ্ঠুর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দ্বারকানাথ তাঁর সোমপ্রকাশে কঠিন সমালোচনা দ্বারা ভারতবাসীকে রাজনীতি সচেতন করে তোলার কঠিন প্রয়াস সারাজীবন ধরে চালিয়ে যান। আসলে তাঁর সোমপ্রকাশ পত্রিকায় রাষ্ট্রদর্শন প্রজাকল্যাণকামী মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। ভারতবর্ষের মতো পরাধীন দেশে উদারনীতিবাদ, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণের মতো জটিল আধুনিক ধারণার সঙ্গে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেশবাসীকে পরিচয় করিয়ে গেছেন তাঁর সোমপ্রকাশ পত্রিকার জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় কলমে।[৩১]

রামমোহন রায়ের মতো পন্ডিত দ্বারকানাথ জনগণের স্বাধীন মতপ্রকাশের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। কারণ স্বাধীন মত প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা করার চেষ্টা মানে বিপ্লব বা স্বাধীনতার স্বপ্নকে দমন করার চেষ্টা। সোমপ্রকাশ সহ অন্যান্য বাংলা সংবাদপত্রে পত্রিকার মুখকে চিরকালের মতো বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের যে আইন পাশ করেছিল, যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতসভার সমগ্র সদস্যগণ, এহেন দোটানায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ নিজেকে সোমপ্রকাশ থেকে সরিয়ে এনে কল্পদ্রুম নামে অপর প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকার প্রকাশ। তাঁর সম্পাদিত কল্পদ্রুম পত্রিকা (১৮৮০-১৮৮৫) সমকালের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার আলোচনা করেছিলেন যা জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক মুহূর্তে গভীর রাজনৈতিক প্রভাব ফেলেছিল।[৩২]

পন্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় পরম যত্নে সৃষ্ট সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে মনোনীত করার ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাসাগরের জন্ম সালটি প্রায় একবছর তফাৎ লক্ষ্য করা গেলেও একই যুগের মানুষ হিসাবে দুজনের মানসপটের মধ্যে ভাব বিনিময়ের দ্বারা পরস্পরের কাছে আসা। মানসিকতার দিক থেকে তিনি (বিদ্যাভূষণ) ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতীব কাছের মানুষ ও আবাল্যের অভিন্নহৃদয় সুহৃদও[৩৩]। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যাবস্থায়, সোমপ্রকাশ পত্রিকা ও পরে কর্মজীবনে তারা ছিলেন সর্বদা পরস্পরের বন্ধুবর, দার্শনিক এবং পরিচালক। বিদ্যাসাগরের মতোই তাঁর ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি ছিল প্রাচীন ভারতীয় দর্শন পরিসরে সীমায়িত। তাঁর মানসিকতার বিকাশে চূড়ান্ত রূপটি নির্ধারণে, বিদ্যাসাগরের মতোই সমকালীন ইউরোপীয় বস্তুবাদী জীবন

দর্শনজাত চেতনাই যে প্রকৃত নিয়ামকের ভূমিকা নিয়েছিল তাঁর স্পষ্ট সাক্ষর বহন করছে সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদনা কর্ম, তাঁর মতাদর্শের আধুনিকতা যুক্তিনিষ্ঠতা বিজ্ঞান মনস্কতায়। সেকালের নব্যজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে যে ইংরাজী ভাষা চর্চা, তা তাঁরা দুজনেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের ইংরাজীর তৎকালীন শিক্ষক রাজনারায়ন বসুর কাছে।[৩৪] বিদ্যাভূষণ অবশ্য হিন্দু স্কুলের শিক্ষক শিক্ষক কৈলাসনাথ বসু-র কাছেও ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের মতোই তাঁরও বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী চিন্তাধারা বিমূর্ততার গন্ডি অতিক্রম করে বাস্তব রূপ পেয়েছিল তাঁর সমাজমুখী নানা জনহিতকর কাজকর্মে। তবে সাংগঠনিক কাজে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের যোগ্য অনুগামী।[৩৫] অসাধারণ ইতিহস চেতনা ও পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন সুস্পষ্টতা সোমপ্রকাশ সম্পাদনায় তিনি এক বিশিষ্ট মাত্রা যোগ করেছিলেন। বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাসাগর দুজনের মধ্যেই ছিল ইতিহাস সম্পর্কে গভীর আগ্রহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বারকানাথ প্রাচীন গ্রীস ও রোম সম্পর্কে যেমন দুটি আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁর অগাধ পান্ডিত্য। তেমনি ভারতবর্ষের একখানা 'প্রকৃত ইতিহাস' রচনা করার পরম সাধ ছিল বিদ্যাসাগরেরও। সেজন্য সারাজীবন ধরে অর্থ সংগ্রহ করার পাশাপাশি সঞ্চয় করেছিলেন ইতিহাস লেখার উপাদানও। কিন্তু নানা কারণে শেষপর্যন্ত সেই কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেই কষ্ট বুকে চেপে গভীর মর্মবেদনা নিয়ে তাকে বিদায় নিতে হয়েছিল। তা জানা যায় তাঁর বিখ্যাত জীবনীকার বিহারীলাল সরকার ও চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিবরণ থেকে।[৩৬] বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাভূষণ দু-জনেই ছিলেন সুগভীর স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং দুজনেই ছিলেন ঐতিহ্য প্রতি পরম আস্থাবান। কিন্তু ঐতিহ্যের জন্য যুক্তিবাদ, মানবিকতাবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁরা কখনই আপস করেননি। সোমপ্রকাশ-এর চরিত্রেও এই গুণগুলি ছিল লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য।[৩৭]

সোমপ্রকাশ পত্রিকার রূপকার বিদ্যাসাগর মহাশয় হলেও যথাযথ পরিমার্জনার দ্বারা এই পত্রিকার বিশিষ্ট রূপটি ফুটিয়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদকের দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের। তবে তাঁর সেই কাজে বিদ্যাসাগরেরই রাজনৈতিক মতাদর্শ পথ নির্দেশিকা ভূমিকা নিয়েছিল। ঠিক তেমনি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কোন রাজনৈতিক চেতনা একদম ছিল না, একথা বলার মতো স্পর্ধা আমার নেই। তবে একথাও ঠিক যে দ্বারকানাথ না থাকলে সোমপ্রকাশ পত্রিকা প্রকাশ, এর পাশাপাশি তাঁর সর্বব্যাপকতা, আন্তর্জাতিকতাবোধ, জাতীয়তাবোধ গঠন নিয়েও বাংলা সংবাদপত্রকে ঘোর সংশয়ের মুখে হাজির করাতো ঠিকই। যা সোমপ্রকাশ পত্রিকার স্বমহিমায় প্রকাশ হওয়াতে কারুর বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। তাই তৎকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে সর্বভারতীয় চেতনার পাশাপাশি জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিক চেতনা বিস্তারে ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার সময় এসেছে।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অসম্ভব পরিশ্রমী ছিলেন। সারাজীবনই তিনি নিজেকে সমাজের জন্য উজার করে দিয়েছিলেন। চুপচাপ বসে থাকাকে তিনি ঘৃণা করতেন। জীবনের অপরাহ্নে এসে মধুমেহ নামক কঠিন রোগের শিকার হয়েছিলেন।

তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়েছিল। সোমপ্রকাশ পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল—জলবায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত কয়েক বৎসর ধরে তিনি মুঙ্গের, কাশী সহ নানা স্থানে ভ্রমণ করে গত কার্তিক মাসে জব্বলপুর ডিস্ট্রিক্ট সাতনা নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে তাঁর সদাশয়তার গুণে তিনি সাতনাবাসী সকলের নিকটেই তিনি শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। সাতনাতে বায়ু পরিবর্তন করতে গিয়ে তিনি সেখানে একটি বিদ্যালয়ের সংস্কার করেন। একটি নাইট স্কুলও স্থাপন করেছিলেন। সাতনা মিউনিসিপ্যালিটির বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন। সাতনায় শবদাহ স্থান নির্মাণের জন্যও তিনি বিলক্ষণ উদ্যোগী হয়েছিলেন। দেশের উন্নতির পক্ষে তিনি এতই চিন্তা করতেন যে, অসুস্থ শরীর নিয়েও ভারতবাসীর ও দেশের লোকের উন্নতি নিয়ে প্রলাপ বকছেন। সহসা তাঁহার গ্রীবা দেশে একটি বৃহৎ কারবঙ্কল হওয়ায় সেখানকার রাজবাটির প্রধান ডাক্তার গোল্ড স্মিথ সাহেব এক পয়সাও গ্রহণ না করে তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন বলে জানায়"[৩৮]।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রথম শিক্ষাগুরু। তাঁর থেকেই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উন্নতি হয়। পূর্বে ভাস্কর, প্রভাকর, সমাচার পত্রিকা প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ সকল ছিল বটে, কিন্তু সংবাদপত্রের উপযুক্ত বিষয়সমূহ সেই সকল পত্রে লেখা হত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুপদ্ধতিতে বাঙ্গালা সংবাদপত্র পরিচালনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেছিলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন কিরূপে করতে হয় তা তিনি প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকদেরকে দেখিয়ে দেন। এখানে পূর্বাপেক্ষা বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহের অনেক উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু সোমপ্রকাশ সংবাদপত্র-ই যে এই উন্নতির মূল, তা সকলকেই স্বীকার করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে দ্বারকানাথ বড় দয়ালু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রকৃত দুরবস্থায় পড়লে কেউই তাঁর সাহায্য লাভে বঞ্চিত হতেন না। তিনি মিতব্যয়ী পরিশ্রমী অধ্যাবসায়শীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কখনও কেউ তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে শোনে নি। অথবা কোন বিষয়ে গোপন করতে দেখেনি। যেমন সত্যপ্রিয়তার বড় আদর করতেন তেমনি মিথ্যাবাদীকে দুই চক্ষে দেখতে পারতেন না। কপটতা তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। যাঁর উপর তাঁর মনোভঙ্গ হত নিনি তার ভয়ানক শত্রু হয়ে দাঁড়াতেন। মিত্রস্থলে তিনি হৃদয় ঢেলে দিয়ে ভালোবাসিতেন। স্বীয় পরিবার, দাসদাসী ও অধিকাংশ প্রতিবেশীদের নিকট ইনি বড়ই প্রিয় ছিলেন। কেউ কখনও তাঁর উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হন নি। তেজস্বীয়তা দ্বারকানাথের গুণাবলির শিরোভূষণ ছিল। তিনি স্বয়ং কখনও কারো আরাধনা করেন নি। চাটুকার লোকের উপরও তার বিষদৃষ্টি ছিল। তাঁর স্বদেশ বাৎসল্য এতই প্রবল ছিল যে, অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি স্বদেশবাসীর উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর"[৩৯]।

দ্বারকানাথের সমসাময়িক খুব অল্প সংখ্যক পন্ডিতের মধ্যেই উদার মানসিকতা দেখা যায়। বেশিরভাগ পন্ডিতই ছিলেন খুব গোঁড়া এবং রক্ষনশীল। বিদ্যাসাগরের মতো তাঁরও এই গোঁড়ামি বা রক্ষনশীলতা দেখা যায় নি। এর সঙ্গে তাঁর প্রচন্ড চরিত্রিক দৃঢ়তা থাকার ফলে তিনি অনেক ব্যাপক আকারে সমাজের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। দ্বারকানাথও উদার মনোভাবের পরিচয় দেন কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো অত ব্যাপক কর্মকান্ড না থাকলেও নিজের ক্ষুরধার লেখনী দিয়েই তা পুষিয়ে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায়

বিদ্যাসাগরের যেমন প্রাঞ্জলতা ছিল দ্বারকানাথও সহজ সাবলীল ভাষায় গদ্য রচনা করে গেছেন। বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত মিশিয়ে লেখা বা বাংলা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত খুব বেশি ব্যবহার করা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বঙ্কিম গোষ্ঠীকে সোমপ্রকাশ গোষ্ঠী তাই 'শবপোড়া মরা দাহের দল' বলে বিদ্রুপ করেছিল। বাংলা ভাষার উন্নতিতে বিদ্যাসাগরের যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল দ্বারকানাথের অবদানও অস্বীকার করা যায় না। তাঁর বিভিন্ন কাজের জন্য বিশেষ করে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনার জন্য তিনি বাঙালীর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্মজীবনে বাংলার সাময়িক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি পল্লীগ্রামের মধ্য থেকে সেখানকার পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আধুনিক সাংবাদিকতার সূত্রপাত করেছিলেন। মেট্রোপলিসের সঙ্গে পল্লাগ্রামের যোগাযোগ সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। ঊনিশ শতকের শেষে বাংলা ভাষাকে সাংবাদিকতা এবং Serious Writing-এর মাধ্যমে হিসাবে প্রসারিত করার চেষ্টা বিশেষ সম্ভাবনাময় ছিল। লক্ষ্য করা যায় যে, পন্ডিত ও উচ্চমানের ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চিন্তাভাবনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না। তবে বাংলাদেশের অনেক প্রচেষ্টার মত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কর্মজীবন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকলেও বিদ্যাসাগরের মতো বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটা কথা ভীষণভাবে সত্যি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে যতই আন্তরিকতা থাকুক না কেন, যতই ত্যাগ স্বীকার থাকুক না কেন যাদের উপর তথ্য প্রচুর পাওয়া গেছে জ্ঞানের সড়ক পথটিতে তারাই বেশি ভীড় করেছে। যে মানুষটি সারাজীবন ব্যাপী বাংলা ভাষায় প্রথম রাজনীতি শিক্ষার পাঠশালাটি নির্মাণ করে গেলেন তার দিকে কেউ ঘুরে একবারও তাকালেন না। দয়া দেখিয়েও না। বিখ্যাত বাংলা প্রবাদটি 'প্রদীপের নীচেই অন্ধকার' এক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য। প্রদীপের শিখা যেমন যেমন নিজেকে জ্বালিয়ে অন্যকে আলো দান করলেও তাঁর নিচে পড়ে থাকা ছায়াকে দুর করতে যেমন অক্ষম ঠিক তেমনি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে পল্লীগ্রামের মধ্যেই অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছিল।

সূত্রনির্দেশ :

অভিজ্ঞানম শকুন্তলম্ সপ্তম তাদের এই ভরতবাক্যের অন্য পাঠান্তর আছে।
প্রবর্তনাং প্রকৃতিহিতার পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়তাম্

১. মহাকবি কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, শ্রী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পাদনা), পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৬, সপ্তম অঙ্ক, ৩৫ নং শ্লোক, পৃ: ৫৭৮।

২. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ: ২৮৬-৮৭।

৩. মির্জা রফিকউদ্দিন বেগ, রাজকুমার চক্রবর্তী, শৌমিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত হরিনাভী স্কুল, কলকাতা, মার্চ ২০১৮।

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম খন্ড, ১৩৮৩, পৃ: ৬।

৫. বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত) সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬ :পৃ: ২৫।
৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, সাহিত্য সাধক চরিত্রমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম খন্ড, ১৩৮৩, পৃ: ১২।

৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ: ২৮৭।

৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সাহিত্যসাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম খণ্ড, ১৩৮৩, পৃ: ৫।

৯. বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত) সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা ১৯৬৬, পৃ: ৪০৩-৪০৪।
১০. সোমপ্রকাশ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৪ জৈষ্ঠ্য ১২৮৫, ২৭ সংখ্যা
১১. সোমপ্রকাশ, অত্যাচার বিষয়ে এদেশীয় জমিদারেরাও বড় কম নন, ২০ শ্রাবণ ১২৬৯।
১২. সোমপ্রকাশ, ১৬ চৈত্র ১২৭০
১৩. সোমপ্রকাশ, আমাদিগের বর্তমান বাণিজ্য ব্যবসায়, ১৪ শ্রাবণ ১২৮৫, ৩৬ সংখ্যা।
১৪. সোমপ্রকাশ, ইংরাজী মূলধন বিনিয়োগে ভারতের উপকার কি? ১৮ বৈশাখ ১২৯০।
১৫. সোমপ্রকাশ, ২৬ চৈত্র ১২৯০।
১৬. সোমপ্রকাশ, ৯ ভাদ্র ১২৯২ ।
১৭. সোমপ্রকাশ, ৯ কার্তিক ১২৮৮ ।
১৮. সোমপ্রকাশ, ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর মহাদোষ, ৫ আশ্বিন ১২৮৭।
১৯. সোমপ্রকাশ, ১ চৈত্র ১২৮৮ ।
২০. সোমপ্রকাশ, ২৮শে আশ্বিন ১২৯১ ।
২১. S. P. Sen (ed.), Dictionary of National Biography, P. 416.
২২. S. P. Sen (ed.), Dictionary of National Biography, P. 416.
২৩। Nirmal Chandra Sinha, Freedom Movement in Bengal (1818-1904), Who's Who, Govt. West Bengal, Calcutta, 1964, P. 127; B. B. Majumder, History of Indian Social Political Ideas, (From Rammohan to Dayananda), Calcutta, P. 156-157.
২৪. Nirmal Chandra Sinha, Ibid, P. 127.
২৫. Nirmal Chandra Sinha, Ibid, P. 128.
২৬. B. B. Majimder, History of Indian Social Political Ideas, (From Rammohan to Dayananda), Calcutta, P. 160.
২৭. B. B. Majumder, Ibid, P. 160.
২৮. Nirmal Chandra Sinha, Ibid, P. 128.
২৯. B. B. Majumder, Ibid, P. 160.
৩০. S. P. Sen (ed.), Dictionary of National Biography, P. 417.
৩১. সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী (সম্পা:), ভারতবর্ষ ও রাষ্ট্রভাবনা, কলকাতা, মে-২০০১।
৩২. S. P. Sen (ed.), Ibid, P. 417.
৩৩. ইন্দ্র মিত্র: করুনা সাগর বিদ্যাসাগর, প্রথম খন্ড, (২য় সংস্করণ), কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৪১।
৩৪. রাজনারায়ন বসু: আত্মচরিত, (৩য় সংস্করণ), কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬১-৬২।
৩৫. সোমপ্রকাশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১৫ই ভাদ্র, ১২৯৩।
৩৬. বিহারীলাল সরকার: বিদ্যাসাগর, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮০; চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংখ্যা, কলকাতা- পৃষ্ঠা-১১০।
৩৭. সোমপ্রকাশ, বিদ্যাভূষণ স্মরণে, ২৯শে ভাদ্র, ১২৯৩।
৩৮. হরিলাল নাথ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮০।
৩৯. ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'এডুকেশন গেজেট', ১৯শে ভাদ্র, ১২৯৩।

জাতীয় আন্দোলনে মেলা ও হাটের ভূমিকা: দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে একটি আলোচনা (১৯০৫-১৯৪৪)

গুরুশংকর বারিক
পি এইচ ডি গবেষক
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:
উনবিংশ শতকের শেষ পর্বে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (বম্বে, ১৮৮৫) পর ভারতের রাজনীতি ক্রমশ সংঘবদ্ধ রূপ নিতে শুরু করে। প্রাদেশিকতার সীমা ছাড়িয়ে কংগ্রেস প্রথম জাতীয় প্রেক্ষিতে আলাপ আলোচনা শুরু করে। তারা সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করলেও সংগঠিত আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। কংগ্রেস বার্ষিক অধিবেশনে সরকারের বিভিন্ন নীতি পরিবর্তনের আবেদন জানিয়ে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্পন্ন করত। বাংলা বিভাজনের ঘোষণা (১৯ জুলাই, ১৯০৫) প্রথম কংগ্রেসের এই সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মসূচিকে আঘাত করে। বাংলা ভাগের বিরোধিতায় কংগ্রেস স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন শুরু করে। এই প্রথম আন্দোলনকে জেলাস্তরে বিস্তারে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতারা জেলায় আন্দোলনের প্রচারে উদ্যোগী হয়। স্থানীয়স্তরে স্বদেশী ও বয়কট কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়। স্বদেশী চেতনার প্রসারে স্থানীয় মেলায় স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনীর উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে স্থানীয়স্তরে স্বদেশী ও বয়কট কর্মসূচির প্রচার ব্যাপক আকার লাভ করে। স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ বিস্তারে মেলা, হাট, লোকগান, যাত্রা প্রভৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শুধু জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার নয় প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে ওঠে এই উপাদান গুলি। আলোচ্য নিবন্ধে জাতীয় আন্দোলনে মেলা এবং হাটের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: মেলা, হাট, জাতীয় আন্দোলন, কংগ্রেস ।

বাংলার গ্রাম জীবনের সঙ্গে মেলা এবং হাট অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। মেলা এবং হাটকে কেন্দ্র করে বাইরের জগতের সঙ্গে গ্রামের আদান প্রদানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর এর প্রভাব অপরিসীম। পূজা পার্বণ উপলক্ষে গ্রামে মেলা বসে। মেলায় বহু নিত্য নতুন আকর্ষণীয় দ্রব্যের প্রসার বসে। মেলা উপলক্ষে গান, যাত্রা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংলগ্ন গ্রাম গুলি আনন্দে মেতে ওঠে। বহু লোকের সমাগম হয়।

অপরদিকে গ্রামে প্রত্যেকদিন বাজার বসার প্রচলন খুব একটা দেখা যায় না। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে গ্রামে যে বাজার বসে তাই হাট নামে পরিচিত। এই হাটে গ্রামের মানুষ তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে। মেলা এবং হাটকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষ একত্রিত হওয়ার সুযোগ পায়। বাইরের এবং স্থানীয় মানুষ এক জায়গায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে। দীর্ঘ দিন ধরে মেলা এবং হাটের মাধ্যমে স্থানীয়স্তরে মানুষের এই একাত্মতা চলে আসছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রথম স্থানীয় মানুষের এই জনসমাগমকে কাজে লাগানো হয়। মেলায় স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে মেলার পাশাপাশি হাটকেও জাতীয় আন্দোলনের প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অসহযোগের শুরু থেকেই স্থানীয়স্তরে জাতীয় আন্দোলন প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অসহযোগ থেকে ভারত ছাড়ো স্থানীয়স্তরে আন্দোলন ব্যাপক আকার লাভ করেছে। তবে স্থানীয় অভাব অভিযোগ এবং প্রতিবাদের মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে এখানে জাতীয় আন্দোলন নিজস্ব রূপ লাভ করে। স্থানীয় আন্দোলনে মেলা, হাট, লোকগান, যাত্রা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইসব উপাদান জাতীয়াতাবাদী চেতনার প্রসারের পাশাপাশি প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। মেলা এবং হাটকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের সমাগমকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস নেতারা খুব সহজে আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা মেলা এবং হাটে ব্যাপক প্রচার চালায়। তবে শুধু প্রচার নয় মেলা এবং হাটকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষ প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন দমন করতে পুলিশ অত্যাচার শুরু করলে তারা মেলা এবং হাটকে বয়কট করে। স্থানীয় মানুষের অসহযোগিতার মুখে পড়ে একের পর এক মেলা এবং হাট বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ পাহারা বসিয়েও অনেক জায়গায় মেলা এবং হাট খোলা যায়নি। মেলা এবং হাট গ্রামস্তরে জাতীয় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে ওঠে।

বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান মেলাকে নিয়ে কম চর্চা হয়নি। এইসব চর্চায় রাজনৈতিক অপেক্ষা সাংস্কৃতিক দিক বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। জাতীয়তাবাদী চেতনা উত্থানের সময় থেকে মেলাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দেখা যায়। মেলার রাজনৈতিক উপযোগিতা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যোগেশচন্দ্র বাগলের 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত'।[১] এই গ্রন্থে নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মেলা'-র বিভিন্ন অধিবেশনের ইতিহাস পাওয়া যায়। দীনেন্দ্র কুমার রায়ের 'রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থে মেলায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়।[২] পরবর্তীকালে অশোক মিত্রের সম্পাদনায় চার খন্ডে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত মেলার একটি দুর্লভ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের পূজা এবং মেলার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] এছাড়াও মহম্মদ কামরুল হাসানের 'বীরভূমের মেলা ও তার প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষিত',[৪] এবং শক্তিপদ ভট্টাচার্যের 'বীরভূমের উৎসব ও মেলা' গ্রন্থে বীরভূম জেলার বিভিন্ন মেলার সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে জানা যায়।[৫] অপর পক্ষে জাতীয় আন্দোলনে হাটের অবদান সম্পর্কে বিশেষ

আলোচনা হয়নি। আদমশুমারিতে বাংলার হাট সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্থানীয় ইতিহাস আলোচনায় প্রসঙ্গ ক্রমে মেলা এবং হাটের কথা উঠেছে। বঙ্গভূষণ ভক্তের 'নন্দীগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রাম'[৬], কিংবা বসন্তকুমার দাসের 'মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রামে খেজুরী থানা' [৭] গ্রন্থে স্থানীয় আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে মেলা এবং হাটের কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে গ্রামস্তরে জাতীয় আন্দোলনে মেলা এবং হাট যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বহুলাংশে অধরা থেকে গিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে স্থানীয়স্তরের জাতীয় আন্দোলনে মেলা এবং হাটের ভূমিকা অনুসন্ধান অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক বইপত্র, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, গোয়েন্দা দপ্তরের প্রতিবেদন প্রভৃতির ভিত্তিতে জাতীয় আন্দোলনে মেলা এবং হাটের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। তবে আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা অর্থ্যাৎ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, হাওড়া এবং হুগলী গুরুত্ব পেয়েছে।

মেলা

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে সভা সমিতি স্থাপনের সময় থেকে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারে মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেলায় স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী মানুষকে আকর্ষণ করে। এইসব প্রদর্শনী দেখতে মানুষ ভিড় জমায়। নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭) এক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র লিখেন - "১৭৮৮ শকের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলার হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগেরমধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য।"[৮] স্বদেশী শিল্পজাত সামগ্রী, কৃষিজ দ্রব্যের প্রদর্শনী এবং ব্যায়াম, কুস্তি ছিল এই মেলার মূল আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনিতে লিখেছেন এই মেলায় স্বদেশী শিল্প সামগ্রী, কৃষি দ্রব্যের প্রদর্শনী, দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা পরিবেশন এবং সম্মানীয় ব্যক্তিদের পুরস্কার দেওয়া হত।[৯] এই মেলা দীর্ঘস্থায়ী না হলেও প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্বদেশী চেতনা বিস্তারের যে উদ্যোগ নেওয়া হয় তার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেস পরবর্তীকালে এই উদ্যোগকে কাজে লাগায়। জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৮৯০) প্রথম স্বদেশী দ্রব্য প্রদর্শনীর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রদর্শনী সাধারণ দর্শকদের মধ্যে প্রভূত আগ্রহের সৃষ্টি করে। শুধু জাতীয় কংগ্রেস নয় পরবর্তীকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে এই প্রদর্শনীর আয়োজন জেলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার ঘটায়। এইভাবে হিন্দু মেলার প্রদর্শনীর উদ্যোগ পরবর্তীকালে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

বাংলা বিভাজনের ঘোষণা প্রাদেশিক রাজনীতিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের প্রভাব স্থানীয় মেলায় পড়তে শুরু করে। এবার শুধু স্বদেশী প্রদর্শনী নয় মেলায় বিদেশী দ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়। বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। কেন্দুলীর মেলায় একদল যুবক বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে মেলায় আগত মানুষকে স্বদেশী আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানায়। জয়দেবের মেলায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একটি বড় সভা হয়।[১০] ভগবানপুর থানার জমিদার ক্ষীরোদচন্দ্র ভূঞ্যার উদ্যোগে দোল পূর্ণিমায় ঠাকুরনগর

মেলায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মাধ্যমে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রচার করা হয়।[১১] এইভাবে স্থানীয় মেলা গুলিতে বিদেশী দ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রচার বাড়তে শুরু করে। তবে স্বদেশী আন্দোলনের এই উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি। মেলায় বিদেশী দ্রব্যের প্রসার আবার জমে উঠতে শুরু করে। দীনেন্দ্র কুমার রায়ের নদীয়া জেলার মুরুটিয়া গ্রামে রথের মেলার বর্ণনায় স্বদেশীর এত প্রচার সত্ত্বেও একটি মিশ্র ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী কাচ, এনামেলের বাসন, পুতুল ইত্যাদি দোকানে ভিড় বেশী দেখেছেন।[১২] এই ঘটনা প্রমাণ করে যে স্বদেশী চেতনা স্থানীয়স্তরে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি। যতটুকু প্রভাব পড়ে তাকে কাজে লাগাতে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের তৎপরতায় ভেজাল স্বদেশী দ্রব্যে বাজার ভরে যায়। দীনেন্দ্র কুমার রায় দেখেছেন স্বদেশী ছাতা বলে যা বিক্রি হচ্ছে তার বাঁটের বাঁশ ছাড়া আর কোনো কিছুই এদেশের না। আবার কাপড় ব্যবসায়ী বোম্বে মিলের কাপড় বলে বিদেশী কাপড় বিক্রি করছে।[১৩] এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মেলায় 'দি গ্রেট্ নেশনাল্ ছারকাচ!' কিংবা 'অত্তাশ্চর্য বন্দেমাতরম্ মেজিক!'-র উপস্থিতি যথেষ্ট আশা জাগায়। সাধারণ মানুষকে আকর্ষিত করতে এইসব নামের ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও দীনেন্দ্র কুমার রায় বানর নাচের বিজ্ঞাপনে 'বন্দেমাতরম্' এবং 'ন্যাশনাল'-কে ব্যবহার করায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।[১৪] তবে 'ন্যাশনাল' ও 'বন্দেমাতরম' কথা গুলি যে এইভাবে বৃহত্তর জনমানসে ছড়িয়ে পড়ে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্থানীয়স্তরে স্বদেশী আন্দোলনের সবথেকে বড় দুর্বলতা বোধহয় বিদেশীর বিকল্প দ্রব্যের অপ্রতুলতা এবং তার মহার্ঘ্য মূল্য। এই কারণে গ্রামের মানুষকে বাধ্য করা যায়নি। অপরপক্ষে তাদের মধ্যে নতুন বিদেশী দ্রব্য পরখ করার ঝোঁক ছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রত্যাহারের পর স্বদেশীর উত্তেজনা একেবারে বিলীন হয়ে যায়। বাজার আবার বিদেশী দ্রব্যে ভরে ওঠে। স্বদেশীর চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখতে কংগ্রেস নেতৃত্ব মেলা এবং প্রদর্শনীর উপর জোর দেয়। কিন্তু বিদেশীর বিকল্প জিনিসপত্র তৈরিতে জোর না দিয়ে কেবল স্বদেশী বাজার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। কংগ্রেস নেতারা স্বদেশী বাজার গুলিকে স্থায়ী করার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। স্বদেশী মেলার শুরু করে দিয়ে নেতারা তাদের কাজ সম্পন্ন করতেন। মেলায় প্রকৃত স্বদেশী দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে কিনা তার অনুসন্ধান করেনি। বিদেশী জিনিসপত্রে দেশে প্রস্তুতের স্টিকার এঁটে খুব সহজে বিক্রি হতে দেখা যায়। এই কারণে 'উপাসনা' পত্রিকা ব্যঙ্গ করে লিখে স্বদেশী দুই দিন জাগার পর আবার কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়ে পড়েছে।[১৫]

মহত্মা গান্ধীর স্থানীয় সত্যাগ্রহের উদ্যোগ সমগ্র ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি রাওলাট বিল এবং খিলাফৎ অন্যায়ের প্রতিবাদে জাতীয় আন্দোলন শুরু করতে উদ্যোগী হয়। এই পরিস্থিতিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নরমপন্থী নেতাদের প্রভাব ক্রমশ কমতে শুরু করে। অথচ স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁদের আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা ছিল। বর্ধমান এবং বীরভূমে সরকারি প্রদর্শনীর উদ্বোধনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসায় সাধারণ মানুষ তা বয়কট করে।[১৬] এমনকি বিনামূল্যের টিকিট নিয়েও কেউ প্রদর্শনী দেখতে আসেনি। অপরদিকে জাতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আগমনের

পর স্থানীয় মেলা গুলিতে খদ্দরের প্রচার বাড়তে শুরু করে। রাণীগঞ্জে খদ্দর এবং অনান্য স্বদেশী দ্রব্যের মেলা হয়।[১৭] বাঁকুড়ার জেলা শাসক গুরুসদয় দত্তের উদ্যোগে কৃষি ও হিতসাধনী প্রদর্শনী খোলা হয়। এই প্রদর্শনীর প্রধান অতিথি আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় উপস্থিত জনগনকে প্রত্যেকের বাড়িতে ১০-১৫ টি তুলা গাছ লাগাতে এবং প্রত্যেকদিন চার থেকে পাঁচ ঘন্টা চরকা কাটার আহ্বান জানান।[১৮] বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লিগের পরিচালনায় তমলুকে একটি বড় স্বদেশী মেলা হয়। এই মেলায় শ্রীষ চ্যাটার্জী, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, কাজি নজরুল ইসলাম, হেমপ্রভা মজুমদার প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতি এবং মূল্যবান বক্তৃতা জনগণকে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।[১৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বরাবর দূরে থেকেছে। তবুও পুরো নির্লিপ্ত থাকতে পারেনি। শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত বসন্ত উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের বক্তৃতা জনমানসে দাগ কাটে। ১৯৩৪-র বসন্ত উৎসবে প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ, সুশোভন সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আচার্য কৃপালিনি প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। আচার্য কৃপালিনী বিশ্বভারতীর ছাত্রদের সামনে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করেন।[২০] এই বক্তৃতা সরাসরি কংগ্রেসের কর্মসূচি বিষয়ক না হলেও ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে। কালনার জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রমের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে খদ্দর ব্যবহার জনপ্রিয় করতে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়া হয়। খদ্দরের প্রচারে এই উদ্যোগ জনগনকে প্রাভাবিত করে।[২১] মেলায় এইসব কর্মসূচির গুরুত্ব অনুধাবন করে বেহালা সেবা সমিতির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে (২২ মার্চ, ১৯২৯) সুভাষচন্দ্র বসু সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারের জন্য মেলাকে হাতিয়ার করার আহ্বান জানান।[২২] তবে মেলা শুধু স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী ছিল না। মেলায় অনুষ্ঠিত যাত্রা, লোকগান, বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থিত জনগনের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। 'কুরুক্ষেত্র' সাময়িক পত্রিকা স্বদেশী যাত্রা দলের তাঁবুতে স্বাস্থ্য, সমাজ, কৃষি, গোপালন বিষয়ে প্রদর্শনী এবং তাঁত চালনা, রেশম তৈরি, ঘড়ি সারানো, ছাতা তৈরি শেখানোর উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানায়।[২৩] এইভাবে মেলায় যাত্রা দেখতে আসা মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মুগবেড়িয়ার জমিদার গঙ্গাধর নন্দের স্মরণে এক বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় চরকা, হলকর্ষণ, সাঁতার এবং কাপড় বোনার প্রতিযোগিতা হয়। মুকুন্দ দাসের যাত্রার দিন প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের জমায়েত হয়।[২৪] স্থানীয় মেলা গুলিতে চরকা প্রতিযোগিতা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। মেলায় এইসব কর্মসূচি জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকে মেলা প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। আইন অমান্যের কর্মসূচি সম্পর্কে জনগনকে অবহিত করতে বসন্ত কুমার মাইতি খেজুরি থানার এক মহরমের মেলায় বক্তৃতা রাখেন। তাঁর বক্তৃতার পর উপস্থিত জনতা 'বন্দেমাতরম' এবং 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দেয়।[২৫] কংগ্রেস মেলায় বিদেশী দ্রব্য বয়কটের কর্মসূচি গ্রহণ করে। স্বেচ্ছাসেবকরা মেলায় উপস্থিত হয়ে জনগণকে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের আহ্বান জানায়। তাঁদের আহ্বান জনমানসে প্রভূত প্রভাব ফেলে। নন্দীগ্রাম থানার রেয়াপাড়ার শিব চতুর্দশীর মেলায় মতিলাল নেহরু এবং চেঁচুয়াহাট,

ক্ষীরাইতে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই মেলায় বিদেশী এবং মাদক দ্রব্য বয়কটের কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়।[২৬] বর্ধমানের পিপলনে জমিদার ক্ষেত্রনাথ ঘোষাল বুড়োরাজ মেলায় বিদেশী দ্রব্য বয়কটের উদ্যোগ নেয়। ডাঃ গুণেন্দ্রনাথ মুখার্জী মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রাম মেলায় সাধারণ মানুষকে বিদেশী দ্রব্য বয়কটে উৎসাহিত করেন।[২৭] বয়কটের উদ্যোগ বাঁকুড়ায়ও নেওয়া হয়। বাঁকুড়ার এক স্থানীয় মেলায় চিনি, কাঁচের চুড়ি এবং অনান্য শৌখিন জিনিসপত্র নিষিদ্ধ করা হয়।[২৮] বয়কটের পাশাপাশি মেলায় আগত বিদেশী এবং মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিংয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভগবানপুর থানার দ্বারিকাপুরে শিবরাত্রির মেলা এবং ময়না থানার গোকুলনগরে গাজনের মেলায় মহিলারা পিকেটিং করার পাশাপাশি উপস্থিত জনতাকে বিদেশী বর্জনের আহ্বান জানায়।[২৯] মেলায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মসূচি বাড়ার কারণে পুলিশ শীঘ্রই কঠোর দমন নীতির আশ্রয় নেয়। বীরভূমের সিউড়ি শহরে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে রথের শোভাযাত্রা বার করা হয়। জগদীশচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে এই শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। এই অপরাধে পুলিশ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র জনতার উপর নির্বিচারে লাঠি চালায়। তবুও কংগ্রেস নেতা জগদীশ চন্দ্র ঘোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে এলে উপস্থিত জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।[৩০] মেদিনীপুরের এগরা থানার কুদি মেলায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা বিদেশী দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়।[৩১] এরূপ একাধিক মেলায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের কর্মসূচির কারণে পুলিশ দমন পীড়ন নীতির স্বীকার হয়। এই কারণে মেলায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মেলায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি অত্যাচার বাড়তে থাকায় স্থানীয় জনগণ বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে সমগ্র মেলা বয়কট করে। সরকারের অনুগত জমিদারদের মেলাও বয়কট করা হয়। পঁচেটের জমিদার যাদবেন্দ্রনন্দন চৌধুরী আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধিতা করায় স্থানীয় জনগণ পঁচেটের বিখ্যাত রাসমেলা বয়কট করে। এই বিখ্যাত মেলার এরূপ জনমানবহীন ছবি সবাইকে অবাক করে দেয়।[৩২] ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় আবার মেলা বয়কটের উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। মেদিনীপুরে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে থানা দখল অন্যতম কর্মসূচি ছিল। কংগ্রেস খেজুরি, সুতাহাটা, পটাশপুর থানা দখল করেত সফল হয়।[৩৩] কিন্তু মহিষাদল থানা দখল করতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়। মহিষাদল রাজপরিবারের ব্যক্তিগত প্রহরী সম্মিলিত জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালানোর কারণে কংগ্রেসের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। এর প্রতিবাদে জনগণ মহিষাদলের বিখ্যাত রথ কিছুটা টানার পর আর এগিয়ে যেতে রাজি হয় নি।[৩৪] রাজার মর্যাদা খর্ব হয়। এইভাবে মেলা স্বদেশী দ্রব্য প্রচার থেকে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

মেলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষেরা একত্রিত হয়। এই কারণে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে আন্দোলনের খবর পৌঁছে দিতে কংগ্রেস মেলায় প্রচারের উদ্যোগ নেয়। কংগ্রেসের এই উদ্যোগ জনমানসে ব্যাপক সাড়া জাগায়। তাদের উৎসাহেই বিদেশী দ্রব্য থেকে মেলা বয়কট সফল হয়েছে।

হাট

জাতীয় আন্দোলনে স্থানীয় মানুষকে সংগঠিত করতে মেলার পাশাপাশি হাটের ভূমিকাও কম নয়। গ্রামে হাটের সংখ্যা, পরিধি স্থানীয় অর্থনীতির সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রয়েছে। হাটের সংখ্যা স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রগতির দিক নির্দেশ করে। ১৯২১-র আদমশুমারিতে দেখা যায় দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় বর্ধমানে ১৫১, বীরভূমে ৪৭, বাঁকুড়ায় ৬০, মেদিনীপুরে ৫১২টি, হুগলীতে ১৬২ এবং হাওড়ায় ১২৪ হাটের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৫] জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে হাট রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত হওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব সহজে আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করা সম্ভব হয়। মেদিনীপুরে হাটের সংখ্যা বেশী হওয়ায় আন্দোলনের দ্রুত বিস্তার হয়।

বিংশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে হাটকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বর্ধমানের মানকর হাটে জমিদার রাজকৃষ্ণ রক্ষিত বিদেশী কাপড় এবং লবণ বিক্রি বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়ায় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এর প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখায়।[৩৬] স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সময় থেকে হাটে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঘরে বাইরে উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশ হাটে স্বদেশী কাপড় এবং সুতো বিক্রির উদ্যোগ নেয়।[৩৭] তাদের এই উদ্যোগ মাড়োয়ারিদের বিদেশী ব্যবসাকে প্রাভাবিত করে। একদল যুবক জোর করে বিদেশী কাপড় পোড়াতে শুরু করে। আন্দোলনকারীরা হাটে বিদেশী দ্রব্য আসার উপায় বন্ধ করতে মাঝিদের নৌকা না আনার জন্য জোর দেয়। মুসলমান মাঝি মিরজান এবিষয়ে অনড় থাকায় তার নৌকা ডুবিয়ে দেয়।[৩৮] এইরূপ একাধিক ঘটনায় জোর করে স্বদেশী চাপিয়ে দেওয়া হয়। স্বদেশীর উত্তেজনা মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপন্যাসে সস্তা বিদেশীর পরিবর্তে দামী স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করতে সাধারণ মানুষের অক্ষমতার বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সমস্যার সমাধান না করে অহেতুক বল প্রয়োগ করায় দাঙ্গা বেধে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে জাতীয় রাজনীতি আবার উত্তাল হয়ে ওঠে। যুদ্ধের কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ক্ষোভের মুখে পড়ে স্থানীয় হাট গুলি। পূর্ববঙ্গে একের পর এক হাট লুঠ হতে শুরু করে। হাট লুঠের ঘটনা পশ্চিম বাংলায়ও দেখা যায়। ১৯১৮-র প্রথম দিকে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে প্রায় ১১-টি হাট লুঠের ঘটনা ঘটে। যুদ্ধের পর খাদ্য শস্যের দাম কমে যাওয়ায় তা হাটে বেশি লুণ্ঠিত হয়নি। হাটে সব থেকে বেশি লুণ্ঠিত হয় কাপড়। উত্তর প্রদেশ থেকে আসা কাপড় ব্যবসায়ীরা এই আক্রমণের মুখে পড়ে। এই ব্যবসায়ীরা কাপড়ের ব্যবসা করার পাশাপাশি উচ্চ সুদের হারে ঋণ দিত।[৩৯] এই সুদের হার স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এই হাট লুঠের ঘটনার কোনো সম্পর্ক ছিল না। দেহজুড়ী হাটে স্বদেশী বস্ত্রের দোকনেও লুঠ হয়। শুধু জঙ্গলমহল নয় হাট লুঠের ঘটনা শীঘ্রই মেদিনীপুরের অপর অংশে সম্প্রসারিত হয়। মেদিনীপুরের তুরকা, সাতমাইল, প্রতাপদিঘী, কাঁথিতে হাট লুঠের ঘটনা ঘটে।[৪০] এইসব হাট লুঠের ঘটনা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে

প্রাভাবিত করে।

অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের চেতনা জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিদেশী দ্রব্য বয়কটের জন্য হাটে প্রচার চালানো হয়। জঙ্গলমহলে শৈলজানন্দ সেন হাটে বিদেশী দ্রব্য বিক্রির বিরুদ্ধে পিকেটিং শুরু করেন।[৪১] তবে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকে হাটকে কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা শুরু হয়। প্রথমেই হাটের মাধ্যমে আন্দোলনের খবর ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আন্দোলনের খবর সাইক্লোস্টাইল পত্রিকার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। হাটে এই পত্রিকা বিক্রির উপর জোর দেওয়া হত। শুধু পত্রিকা বিক্রি নয় আন্দোলনের খবর ছড়িয়ে দিতে হাটে উপস্থিত জনতার সামনে পড়ে শোনানো হত। কাঁথি সত্যাগ্রহ প্রচারপত্র সংগ্রহ করে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা গোপীবল্লভপুর হাটে উপস্থিত জনতার সামনে পড়ে শোনাতেন। এছাড়াও এই প্রচারপত্রের নকল করে তা আরো বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়।[৪২] হাটে আন্দোলনের খবর উপস্থিত জনসাধারণকে দারুণ প্রভাবিত করে। এই খবরে উদ্দীপ্ত হয়ে তারাও আন্দোলনে যোগদান করে। চৌকিদারী কর বন্ধের আগে হাটে ঢাক পিটিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। এই খবর হাটের মাধ্যমে দ্রুত বৃহত্তর জনমানসে ছড়িয়ে পড়ে শক্তিশালী আন্দোলনের ভিত প্রস্তুত করে দেয়। অপরদিকে বিদেশী এবং মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে বয়কট এবং পিকেটিংয়ের কেন্দ্র হয়ে ওঠে হাট। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা বিদেশী এবং মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলেন। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা হাটে বিদেশী দ্রব্যের বিরুদ্ধে পিকেটিং শুরু করে। মেদিনীপুরের রামনগর থানার বালিসাই, দুর্গাপুর, মিরগাদা হাটে বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা হয়। চারুচন্দ্র মহান্তির নেতৃত্বে দাঁতনের কালিচন্ডী হাটে পিকেটিং করা হয়। [৪৩] নন্দীগ্রাম থানার তেখাল, তেরপাখিয়া এবং রাধাগঞ্জের হাটে বিদেশী ও মাদক দ্রব্যের পিকেটিং করা হয়। স্বেচ্ছাসেবকরা দোকানে পিকেটিংয়ের সময় বিদেশী লবণ নষ্ট করে দেয়। রামতাড়ক হাটে বিদেশী লবণ নষ্ট করার কর্মসূচিতে পূর্ববঙ্গের স্বেচ্ছাসেবকরাও যুক্ত ছিলেন।[৪৪] তবে শুধু বিদেশী দ্রব্য বয়কট এবং পিকেটং নয় হাটে লবণ সত্যাগ্রহে প্রস্তুত লবণ বিক্রিতে জোর দেওয়া হয়। কাঁথি মহকুমা সত্যাগ্রহ প্রচারপত্রে সাবাভুট, ডাউকি এবং মির্জাপুর হাটে প্রচুর বেআইনি লবণ বিক্রির খবর পাওয়া যায়।[৪৫] এইভাবে হাটকে কেন্দ্র করে সংলগ্ন অঞ্চলে জাতীয় আন্দোলনের প্রভূত প্রভাব পড়ে।

হাটকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের এই উদ্যোগ শীঘ্রই পুলিশের নজরে পড়ে। হাটে স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম বন্ধ করতে পুলিশ ব্যাপক দমন পীড়ন চালায়। দাসপুর থানার চেঁচুয়াহাটে হাটবারে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে এলে উপস্থিত জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা পুলিশের থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। উত্তেজিত জনতার হাতে দাসপুর থানার সাব ইনস্পেক্টার খুন হয়।[৪৬] নাচিন্দা হাটে প্রচারপত্র বিক্রি করার অপরাধে ভুবন চন্দ্র মাইতিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রত্যেকটি হাটে পুলিশের অত্যাচার বাড়তে থাকে। পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সবশেষে তারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য হাট বয়কট করে। একের পর এক হাট বন্ধ হয়ে যায়।[৪৭] কেশপুর

থানার আনন্দপুর হাট, দাঁতনের কালিচন্ডী হাট, শালবনি হাট, বালিচক হাট, পাঁশকুড়ার আমদানি হাট বন্ধ হয়ে যায়। হাট পুনরায় খুলতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করতে শুরু করে। হাটে যাতে স্বেচ্ছাসেবকরা পুনরায় বাধা দিতে না পারে তার জন্য পুলিশি প্রহরা বসানো হয়। বালিচক হাট খোলার পর স্বেচ্ছাসেবকরা আবার বন্ধ করে দিতে উদ্যত হয়। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পুলিশ হাটে স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মসূচি প্রতিরোধ করার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের হাটে বসার জন্য চাপ দিতে শুরু করে। যে সমস্ত ব্যবসায়ী হাটে বস্তে অস্বীকার করে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। তমলুকে এই কারণে ১৪ জন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৪৮] একই কারণে শালবনি হাটের ব্যবসায়ীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশের চাপে অনেক ব্যবসায়ী হাটে বসতে বাধ্য হয়। হাট বন্ধ করতে স্থানীয় মানুষ এবার নতুন এক পন্থা নিতে শুরু করে। হাটে যাওয়ার পথে ব্যবসায়ীদের রাস্তায় আটকে দেওয়া হয়। এইভাবে শালবনি হাট পুনরায় খোলার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়।[৪৯] ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কংগ্রেস আবার হাটকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। কংগ্রেস কর্মীরা স্থানীয় হাট বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেখানে দোকানিরা রাজি হয়নি সেখানে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা জোর করে হাট বন্ধ করে দেয়। মেদিনীপুরে নারায়ণগড় হাট, ব্যবর্তাহাট, কালীরহাট লুঠ করা হয়। মহিষাদলের ভোলসারা হাটে কংগ্রেস ২৬-শে জানুয়ারি ১৯৪৩ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। এই পতাকা নামাতে হাটের এক দোকানি চৌকিদারকে সাহায্য করায় কংগ্রেস তাকে জরিমানা করে।[৫০] অনেকক্ষেত্রে হাট বন্ধ করতে মুসলিম ব্যবসায়ীরা রাজি হয়নি। এই অসহযোগীতার জন্য কংগ্রেস হাট লুঠ করে। এগরা হাট লুঠের পিছনে মুসলিম ব্যবসায়ীদের অসহযোগীতাই প্রধান কারণ ছিল।[৫১]

উপসংহার

গ্রামস্তরে জাতীয় আন্দোলনের বিস্তারে মেলা এবং হাট এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। গ্রামের মানুষের জীবনে এই দুই উপাদানের প্রভাব অপরিসীম। গ্রামের অন্তর এবং বর্হিজগতের মিলন ক্ষেত্র হয়ে আছে মেলা এবং হাট গুলি। স্বদেশীর চেতনা প্রথম মেলা এবং হাটের মাধ্যমে গ্রামে এসে পৌঁছায়। গ্রামের মেলায় 'দি গ্রেট্ নেশনাল্ ছারকাচ!' কিংবা 'অত্তাশ্চর্য বন্দেমাতরম্ মেজিক!'-র উপস্থিতি যে সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তা অস্বীকার করা যায় না। মেলা এবং হাটে গ্রামের মানুষের সমাবেশ পরবর্তীকালে স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদেরকে এখানে জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করে। মেলা এবং হাটে সমবেত মানুষের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের চেতনা খুব সহজে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। অপরদিকে স্বদেশীর সময় থেকেই মেলা এবং হাটকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ক্রমে আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে। শুধু প্রচার নয় বিদেশী কাপড় পোড়ানোর কর্মসূচী লক্ষ্য করা যায়। মেলা এবং হাটকে কেন্দ্র করে বয়কট ও পিকেটিং আন্দোলন আইন অমান্যের সময় থেকে ব্যাপক আকার ধারণ করে। হাট খোলা রাখতে সরকার পুলিশ প্রহরা বসাতে বাধ্য হয়। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় হাট খোলা রাখাকে কেন্দ্র করে মুসলিম ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিরোধ বাধে। মেদিনীপুরে কিছু মুসলিম ব্যবসায়ী হাট বন্ধ করতে অস্বীকার করায় তাদের দোকান লুণ্ঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের জরিমানা করা হয়। তবে এইসব ঘটনাকে নিয়ে পূর্ববঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের

মত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তীব্র হয়ে উঠতে দেখা যায়নি। একথা অস্বীকার করা যায় না যে অনান্য জেলা অপেক্ষা মেদিনীপুরে মেলা এবং হাটকে জাতীয় আন্দোলনে অধিক কার্যকরী রূপে প্রয়োগ করা হয়। এই কারণে আন্দোলনের তীব্রতাও অনান্য জেলার থেকে মেদিনীপুরে বেশি অনুভূত হয়।

সূত্র নির্দেশ

১ বাগল, যোগেশচন্দ্র, হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত, প্রথম সং.,কলকাতা: তালপাতা, ২০০৯, পৃ. ২২।
২ রায়, দীনেন্দ্র কুমার, রচনা সংগ্রহ, প্রথম সং., কলকাতা: আনন্দ, ২০০৪, পৃ. ৪০।
৩ মিত্র, অশোক (সম্পা.) পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, প্রথম সং., দিল্লী: দি ম্যানেজার অব্ পাবলিকেশনস্, ১৯৬৯।
৪ হাসান, মহ. কামরুল, বীরভূমের মেলা ও তার প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষিত, প্রথম সং., কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৯।
৫ ভট্টাচার্য, শক্তিপদ, বীরভূমের উৎসব ও মেলা, প্রথম সং., কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৭।
৬ ভক্ত, বঙ্গভূষণ, নন্দীগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রথম সং., মেদিনীপুর: আনন্দম, ১৯৮৯, পৃ. ৩৬।
৭ দাস, বসন্তকুমার, মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রামে খেজুরী থানা, প্রথম সং., মেদিনীপুর: খেজুরি ইতিহাস সংরক্ষণ সমিতি, ২০১২, পৃ. ১৫।
৮ বাগল, যোগেশচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
৯ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, চতুর্থ সং., নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১৭, পৃ. ৮৫।
১০ দাস, অজিত কুমার, জয়দেব-মেলা সেকালের ও একালের, প্রথম সং., বীরভূম: অপূর্ব কুমার দাস, ২০০১, পৃ. ২২৬।
১১ ভক্ত, বঙ্গভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
১২ রায়, দীনেন্দ্র কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
১৩ তদেব, পৃ. ৪১।
১৪ তদেব, পৃ. ৪২।
১৫ "পল্লীবাণী", উপাসনা, স. যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্ত্তিক, ১৩২১, কলকাতা, পৃ. ৯৭।
১৬ "বর্ধমান প্রদর্শনী", বাসন্তী, স. বিজয়রত্ন মজুমদার, ২২-ই ফাল্গুন, ১৩২৭, কলকাতা, পৃ. ৪৪।
১৭ "খদ্দর মেলা", এডুকেশন গেজেট, ২২শে ভাদ্র ১৩২৯, কলকাতা।
১৮ "বাঁকুড়ায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়", বাঁকুড়া লক্ষ্মী, স. শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩২৯, কলকাতা, পৃ. ১৫।
১৯ The Congress Party. File No. 40/1925, I.B. Reports, West Bengal State Archives, Kolkata.
২০ Forward, "spring festival", Kolkata, 4th March, 1934, p. 10.
২১ Samities and Sabha in Bengal. File No. 116/1927, I.B. Reports, West Bengal State Archives, Kolkata.
২২ বসু, সুভাষচন্দ্র, তরুণের আহ্বান, প্রথম সং., কলকাতা: জয়শ্রী, ১৯৮৪, পৃ. ৫১।
২৩"লোক শিক্ষার অভিনব পন্থা", কুরুক্ষেত্র, আশ্বিন, ১৩৩৫, কলকাতা, পৃ. ৩৪।
২৪ "গঙ্গাধরের মেলা", আর্থিক উন্নতি, স. বিনয় কুমার সরকার, শ্রাবণ, ১৩৩৮, কলকাতা, পৃ. ২৮২।
২৫ দাস, বসন্তকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
২৬ ভক্ত, বঙ্গভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
২৭ Burdwan civil disobedience. File No. 105y/ 30, I.B. Reports, West Bengal State Archives, Kolkata.
২৮ Chatterjee, Srilata, Congress Politics in Bengal 1919-1939, First Edition., Lon-

don: Anthem Press, 2002, p. 163.
২৯ Pal, Rina, Women of Midnapore in Indian freedom Struggle, First Edition., Kolkata: Aruna Prakashan, 2013, p. 71 and 72.
৩০ Civil Disobedience Birbhum. File No. 105t/30, I.B. Reports, West Bengal State Archives, Kolkata.
৩১ মাইতি, শৈলেন্দ্রনাথ সম্পা., স্বাধীনতা সংগ্রামে এগরা থানা ও আঞ্চলিক জমি-জন-জীবন প্রসঙ্গ, প্রথম সং., এগরা: অবকাশ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৮৮।
৩২ Civil Disobedience Birbhum. File No. 105t/30, I.B. Reports, West Bengal State Archives, Kolkata.
৩৩ ধাড়া, সুশীলকুমার, প্রবাহ, প্রথম সং., কলকাতা: জনকল্যান ট্রাষ্ট, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৩।
৩৪ গোস্বামী, গোপীনন্দন, বাংলার হলদিঘাট তমলুক, প্রথম সং., মেদিনীপুর: বিশ্ববানী পাঠাগার, ১৯৭৩, পৃ. ৩০।
৩৫ Census of India, 1921, Volume V: Bengal Part 1. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot. P. 393.
৩৬ দেবশর্মা, বলাই, বর্ধমানের ইতিহাস, প্রথম সং., বর্ধমান: ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৩।
৩৭ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড। প্রথম সং., কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ. ৬৬।
৩৮ তদেব, পৃ. ৭৩।
৩৯ Dasgupta, Swapan, "Adivasi Politics in Midnapur, c. 1760-1924", in Subaltern Studies iv: Writings on South Asian History and Society, edited. Ranajit Guha, Delhi: Oxford University Press, 1985, p. 123.
৪০ "কাঁথির হাট লুট", নীহার, ১৫ জানুয়ারি, ১৯১৮, কাঁথি: পৃ. ২।
৪১ Chatterjee, Srilata, Ibid, p. 99.
৪২ দে, মধুপ, ঝাড়গ্রাম ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম সং., কলকাতা: মনফকিরা, ২০১৩, পৃ. ১১১।
৪৩ Propaganda in Connection with the Boycott of Foreign Cloth. File No. 151/29, I.B. Reports, West Bengal State Archives, Kolkata.
৪৪ Release of C. D. Prisoners Convicted in the District of Midnapore. File No. 207/31 (1-13), Home Confidential, West Bengal State Archives, Kolkata.
৪৫ Civil Disobedience Birbhum. File No. 105t/30, I.B. Reports, West Bengal State Archives, Kolkata.
৪৬ Fortnightly Reports on the Political Situation in Bengal for the Year 1928. File No. 90/1928, I.B. Reports, West Bengal State Archives, Kolkata.
৪৭ Circulation of Unauthorised News Sheets (Kanthi Satyagraha Pracharpatra). File No. 771/30, Home Confidential, West Bengal State Archives, Kolkata.
৪৮ Weekly Reports on Civil Disobedience for Week ending the 20th May 1933. File No. 14/33, Home Confidential, West Bengal State Archives, Kolkata.
৪৯ Weekly Reports on Civil Disobedience for Week ending the 2nd September, 1933. File No. 13/33, Home Confidential, West Bengal State Archives, Kolkata.
৫০ Daily Report of Public Reaction to Congress Movement - 2nd February 1943. File No. 12/43, Home Confidential, West Bengal State Archives, Kolkata.
৫১ Bi-weekly reports from Bengal, Calcutta to Home New Delhi for the Months of February and March. File No. 21/43, Home Confidential, West Bengal State Archives, Kolkata.

ISSN-2319-8591

স্বাধীনতা পরবর্তী মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতের অন্তর্ভুক্তিঃ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

মোঃ নাসির আহমেদ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে জন্ম নিয়েছিল দুটি নতুন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। দেশভাগের জন্য কে দায়ী তা নিয়ে এই দুটি দেশের ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথমদিকে শুরু হয়েছিল নানা বিতর্ক, যা দীর্ঘ বছর ধরে চলতে থাকে। পরবর্তীতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে জন্ম নেয় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। দেশভাগের কারণের চেয়েও ইতিহাসচর্চায় বেশি গুরুত্ব পায় জনসমাজের ওপর দেশভাগের প্রভাব। কাঁটাতার কীভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে আরো জটিল করে ফেলেছিল তারও নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলতে থাকে। সাধারণ মানুষের কাছে সীমান্তরেখার কাঁটাতারের যন্ত্রণা এমনকি তাদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের সম্মুখীন করে দিয়েছিল। এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতভুক্তির নানা টানমাটাল পরিস্থিতি ও সীমান্তরেখার উপস্থিতির ফলে আমজনতার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন টানাপোড়েনের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

শব্দ সূচকঃ সীমানা কমিশন, কাঁটাতার, পার্টিশন, Radcliffe Award,

মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবের পর ১৯৪৭ সালের ১৮-ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ‘ভারতের স্বাধীনতা আইন’ পাসের মধ্য দিয়ে ভারত বিভাজনের বিষয়টি পাকাপাকি করা হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেনের পরবর্তী কাজ ছিল বাংলা ও পাঞ্জাবের মধ্যে দুটি সীমানা কমিশন গঠন করা। যার চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার সিরিল রেডক্লিফ। বাংলা সীমানা কমিশনের চারজন সদস্য ছিলেন চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিজন কুমার মুখোপাধ্যায়, আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরাম, এবং এম এ রহমান। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল মাত্র ছয় সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমারেখা টানা। রেডক্লিফ রোয়েদাদে যে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তা ভাইসরয় পর্যন্ত স্বীকার করে বলেন নিশ্চিতভাবে উভয় দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে নিদারুণ ক্ষোভের উদ্রেক করবে।[১] এই বিভাজনের ফলে পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষেরা পূর্ব পাঞ্জাব তথা ভারতে চলে এসেছিলেন ও পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। শুধুমাত্র ১৯৫১ সালে দেখা যায় ৭২২৬০০০ জন মুসলিম ভারত

থেকে পাকিস্তান এবং ৭২৪৯০০০ জন হিন্দু ও শিখ পাকিস্তান থেকে ভারতের সীমানা পারাপার করে। এটা পরিষ্কার যে ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি কোনো সমাধান এনে দিতে পারেনি, যদিও দেশভাগকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এবং তার থেকে নবগঠিত দুই দেশকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় হতে হয়। আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় দেশভাগের কারণ হিসেবে প্রথমদিকে ব্রিটিশ সরকারের 'Policy of Divide of Rule' কে দোষারোপ করা হয় এবং তার সঙ্গে জিন্নাকেও টানা হয়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতিকালের গবেষণায় দেখা যায় জাতীয়তাবাদী নেতারাও ১৯৪৭ সালের দেশভাগের জন্য সমানভাবে দায়ী। ১৯৪৭ সালের ১৭-ই আগস্ট Radcliffe line-এর ঘোষণার পর অনেকেই ভেবেছিলেন যে সব সমস্যার সমাধান হয়তো হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজও কিছু সমস্যা রয়েই গেছে।[২]

এই অখন্ড ভারতের বুকে "দেশভাগ" নামক যে অস্ত্রোপচার হয়েছিল তা কোনভাবেই সঠিক হয়নি। উদাহরণ হিসেবে যদি আমরা দেখি, আমাদের শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে আমরা সেই সমস্যার বিশেষজ্ঞের কাছে চিকিৎসা করার জন্য দ্বারস্থ হই, যাতে আমরা সুচিকিৎসা পেতে পারি । কিন্তু Cyril Radcliffe কে যে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল সেই কাজে তার কোনো বাস্তব জ্ঞান ছিল না। কারণ প্রথমতঃ তিনি ভারতে কোনো দিনই অবস্থান করেন নি। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার কোনো প্রেক্ষাপটও তার জানা ছিল না। তৃতীয়তঃ এই ধরনের সমস্যা সমাধানের পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতাই তার ছিল না।[৩] ১৯৪৭ সালের ৩-রা জুন পরিকল্পনা অনুসারে Bengal Legislative Assembly-তে দুইটি দল তৈরি হয়েছিল। একদিকে প্রতিনিধিত্ব করছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার প্রতিনিধিরা এবং অন্যদিকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার প্রতিনিধিরা। ২০-ই জুন তারা ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে মিলিত হয় এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার প্রতিনিধিরা বাংলা ভাগের পক্ষে, অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার প্রতিনিধিরা বাংলা বিভাজনের বিপক্ষে ভোট প্রদান করেছিলেন। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি Bengal Legislature হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ প্রতিনিধিদের দ্বারা বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের ১২-ই আগস্ট Radcliffe Award প্রায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৪-ই ও ১৫-ই আগস্ট যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়া হবে।[৪] কিন্তু Radcliffe Award প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মাউন্টব্যাটেন হঠাৎ করে চুপ হয়ে যান । Sir Radcliffe-এর উপর দায়িত্বভার দিয়ে তিনি ইতিমধ্যে করাচি চলে গিয়েছিলেন। Radcliffe Award ঘোষণা করা হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৭-ই আগস্ট । জয়া চ্যাটার্জী তাঁর 'Partition Legacies' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মাউন্টব্যাটেন ঠিক কি কারণে Radcliffe Award ঘোষণা করতে দেরি করলেন? তার পিছনে কি কোনো কারণ ছিল যে এই ঘোষণা জনগণকে অখুশি করতে পারে?[৫] Radcliffe-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। সীমানা কমিশনের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত প্রশ্নে, লোকসংখ্যার অনুপাত, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। যেমন অভিযোগ উঠেছিল খুলনা জেলার প্রতি অবিচার

করা হয়েছিল। আসলে Radcliffe-এর ঘোষণা হিন্দু বা মুসলিম কোনো পক্ষকেই তুষ্ট করতে পারেনি। পন্ডিত নেহেরু পার্বত্য অঞ্চল চট্টগ্রামের ভারতভুক্তির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন, অন্যদিকে আবার লিয়াকত আলী উল্টে অভিযোগ করেন যে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা দুটি Radcliffe পাকিস্তান ভুক্ত করেন নি।[৬]

Radcliffe Commission গঠন হওয়ার আগে বাংলাকে ভেঙে দুই খন্ড করার দাবিদার ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা । একদিকে Hindu Co-ordination Committee ও Congress Party এবং অন্যদিকে Bengal Provincial Muslim League ছিল। তবে এদের মধ্যে বাংলা বিভাজনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। আবার অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী ও আব্দুল হাসিম দুজনই চেয়েছিলেন ঐক্যবদ্ধ ও সার্বভৌম বাংলা, যা ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের থেকেই স্বাধীন থাকবে। তাতে স্থানীয় অগ্রগণ্য কংগ্রেস নেতা শরৎ বোস সমর্থনও করেছিলেন। কিন্তু বাংলার বাতাবরণ সাম্প্রদায়িক হওয়ার কারণে অধিকাংশ হিন্দুরাই মনে করেন যে এই পদক্ষেপের জন্য এক বৃহত্তর পাকিস্তান গড়ে তোলা হবে যার মধ্যে থাকবে আর্থিক দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতা শহর।[৭] আবার এও দেখা যায় কংগ্রেস সমর্থক আশরাফুউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বিভাজনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং নিজামুদ্দিনের পার্টির লোকজন বাংলা বিভাজনের বিরোধিতা করেছিলেন কারণ তারা সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।[৮]

বাংলা বিভাজনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক আরও জোরালো হতে থাকে, যখন প্রশ্ন উঠে বাংলার সীমানা কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে তা নিয়ে। মুসলিম লীগের দাবি ছিল একটা বিশাল অঞ্চলকে পূর্ববঙ্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি করা। তাদের যুক্তি ছিল বাংলা জনসংখ্যার অনুপাতে একটা মোট রাজস্বের অংশ হিসেবে সমগ্র কলকাতা নগরসহ কলকাতার পশ্চিম দিকের এলাকাগুলিকে যুক্ত করা। এর পিছনে কারণ দেখিয়েছিল যে জুট মিল, সামরিক ঘাঁটি, অস্ত্র কারখানা, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ও লাইন ইত্যাদি গুলি পূর্ব বাংলার অর্থনীতি, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং প্রতিরক্ষার জন্য অপরিহার্য ছিল। এমনকি মুসলিম লীগ দাবি করেছিল হুগলি ও ভাগীরথী নদীর পূর্ব দিকের সমস্ত অঞ্চলকেও। যার ফলে দেখা যায় বাংলার হিন্দু জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ পূর্ববঙ্গে চলে যাচ্ছে।

অন্যদিকে Central 'Co-ordinance committee' গঠিত হয়েছিল Congress, Hindu Mahasabha, Indian Association, New Bengali association- এই চারটি পার্টি নিয়ে। এই কমিটিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রেসিডেন্ট এবং জে.বি. কৃপালিনী চেয়ারম্যান নিয়োগ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে Boundary Commission-কে কেন্দ্র করে এদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। হিন্দু মহাসভা এবং নিউ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন দশটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, খুলনা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি এবং দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা মালদা ও মুর্শিদাবাদ, এছাড়াও নদিয়া, ফরিদপুর ও দিনাজপুরের একটা বিরাট অংশ এবং রংপুর ও রাজশাহী জেলার নির্বাচিত কিছু থানা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির দাবি করেছিল। এর ফলে বাংলার মোটামুটি ৫৭

শতাংশ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চলে আসছে।

বাংলা বিভাজনের বিতর্কে কংগ্রেসের প্রতিনিধি আইনজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্ত একেবারেই অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেন। ৪৬ শতাংশ জনসংখ্যার জন্য ৫৭ শতাংশের ভূখণ্ডের দাবি সীমানা কমিশনের কাছে টিকবে না। যা দাবি করা হচ্ছে তাতে যদি কোনো যৌক্তিকতা না থাকে তবে তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তিনি দুটি পরিকল্পনার কথা বলেন একটি- 'Congress scheme' যা পার্টির বেশিরভাগ সদস্যের দাবি ছিল এবং দ্বিতীয়টি হলো 'Congress plan'।নিম্নে প্রদত্ত মানচিত্রে বিষয়টি দেখানো হল।[৯]

১৯৪৭-এর মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির দ্বারা প্রকাশিত হয় - The origin and the progress of the partition movement in Bengal নামক প্রচারপত্র। বাংলার এই কমিটি ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর মাসে গঠন করা হয়েছিল। যার নেতৃত্বে ছিল কংগ্রেস এবং এদের উদ্দেশ্য ছিল নতুন পশ্চিমবঙ্গ গঠনে সীমান্ত সংক্রান্ত প্রস্তাব দেওয়া। এই কমিটির মধ্যে আবার তৈরি হয়েছিল 'জাতীয় বঙ্গ সংগঠন সমিতি' এবং এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও সেক্রেটারি ছিলেন হুগলি কংগ্রেসের সেক্রেটারি অতুল্য ঘোষ। এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা নদীয়া, যশোর, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তরবঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করা এবং বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চল গুলিকে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করা। জাতীয় বঙ্গ সংগঠন সমিতি মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব না বুঝেই শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য ভারত বিভক্তিতে রাজি ছিল না। বাংলা প্রদেশ বিভাজনের সময় নদীর নব্যতা বা 'River System'-এর বিষয়টিও সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের তরফ থেকে মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার নদীর গুরুত্ব বুঝে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবি করেছিলেন। এই দাবির পিছনে কংগ্রেসের যুক্তি ছিল যে, কলকাতা বন্দর কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবহমান ভাগীরথী, জলঙ্গি ও মাথাভাঙ্গা নদীর অন্তর্ভুক্তি করা অপরিহার্য।[১০] দেশভাগের সাথে বাংলা বিভাজনে মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্তির একটা বিশাল বড় গুরুত্ব ছিল। তাই কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং নিউ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন- এই চারটি পার্টি মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব বুঝে তারা যে কোন কিছুর বিনিময়ে এই জেলাকে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি ছিল। এমনকি তারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনা জেলাকে যে কোনো মূল্যে মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে বিনিময় করতে প্রস্তাব দিয়েছিল। মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াসিফ আলী মির্জা এই জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অন্তর্ভুক্তি করার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমনকি তিনি দেশভাগের পূর্বে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভারত ভাগের বিরোধিতা করেছিলেন। ওয়াসিফ আলী মির্জার সক্রিয় উদার মনোভাব থাকার ফলে মুর্শিদাবাদে কোন ধরনের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয়নি। এছাড়াও কংগ্রেস দলের রেজাউল করিম ও আব্দুস সামাদের অগ্রগন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আবার নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভাগাভাগি করার প্রস্তাবকে অনেকে মেনে

নেননি। এই ধরনের উদাহরণ পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। ১৯৪৭ সালের ১-লা জুন বহরমপুরের গ্রান্ড হলে অনুষ্ঠিত মুর্শিদাবাদের জাতীয় সম্মেলনের এক সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী হিন্দুদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য বিভাজনের 'Contiguity' এবং 'Other Factors' ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের কথা কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।[১১] সীমানা নির্ধারণের সময় শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ভৌগোলিক সংলগ্নতার তার বিচার করলে চলবে না, তার সাথে বিভিন্ন এলাকার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিষয়টি ভেবে দেখার প্রস্তাব উত্থাপিত করা হয়েছিল। এই ধরনের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিবেচনার কথা উল্লেখ করে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও যশোর জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমনকি ১৯৪৭ সালের ১৫ ও ১৬-ই আগস্ট মুর্শিদাবাদ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।[১২] মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি মালদা জেলাতেও তৎকালীন সময়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন হয়েছিল। এই দুই জেলার বাসিন্দারা ধরে নিয়েছিল যে তারা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত নাগরিক। যার কারণে এই জেলার বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে অনুষ্ঠান, জয় ধ্বনির স্লোগান ও পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল।[১৩]

সীমানা কমিশন মূলত ১৯৪৭-এর ৩-রা জুন মাউন্টব্যাটেনর পরিকল্পনায় ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৪৭-এর ১৪ ও ১৫-ই আগস্ট দুই দেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও বাংলা বিভাজনের ফলে কোন জেলা কোন দেশে পড়েছে তখন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে তা নিয়ে অনিশ্চিয়তা রয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার দুদিন পরে ১৭-ই আগস্ট Radcliffe Award ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বাংলার মানুষ তা জানতে পারে। উভয়পক্ষের দরকষাকষির মধ্যে পড়েই Radcliffe এর নেতৃত্বে সীমানা কমিশনকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছিল। Radcliffe এর ঘোষণা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। বহু অনিশ্চয়তার কারণে এই কমিশনের সিদ্ধান্ত অনেক বিতর্কের জন্ম দেয়। তার সাথে আরও একটি বিষয় হলো যে ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং তাড়াহুড়োর মধ্যে বাংলাকে বিভক্ত করে দুই বাংলার সীমারেখা চূড়ান্তভাবে টানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

বাংলা বিভাজনের ক্ষেত্রে সীমানা কমিশন প্রাধান্য দিয়েছিলেন সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন থানা, যেটা ভারত সরকারের আদমশুমারি দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। Radcliffe কংগ্রেসের দেওয়া পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন যে মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গানদীর প্রাকৃতিক গতিপ্রকৃতির ফলে হুগলি নদীর অস্তিত্ব টিকে রয়েছে এবং যার কারণে সমগ্র মুর্শিদাবাদকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হোক। তার বিনিময়ে খুলনা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, শুধুমাত্র মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্বে যেসব অঞ্চল গুলো রয়েছে সেগুলি ছাড়া। তবে এও জানা যায় যে মুর্শিদাবাদ ও নবদ্বীপ পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তিতে কিছু মুসলিমদের মধ্যে এবং জলপাইগুড়ির দক্ষিণাঞ্চলের পাঁচটি থানা পূর্ববঙ্গে অন্তর্ভুক্তিতে কিছু হিন্দুদের মধ্যে বেশ কিছুটা তিক্ততা ফুটে উঠে। পূর্ববঙ্গে আবার খুলনা জেলার কংগ্রেস কমিটির লোকেরা অভিযোগ দায়ের করেন যে খুলনার সঙ্গে মুর্শিদাবাদকে যেন বিনিময় করানো হয় । কিন্তু সীমানা কমিশনের দুই হিন্দু সদস্য

বিচারক বিজন কুমার মুখার্জি ও বিচারক চারুচন্দ্র বিশ্বাস পরিষ্কারভাবে তা প্রত্যাখান করে দেন।

দুই বাংলার বেশিরভাগ আমজনতা সীমানা কমিশন দ্বারা ঘোষিত 'Radcliffe Award' এর সেই নথির ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেনি এবং তারা জানত না এই কমিশন কি বা এতে কি আছে? এই ঘটনার প্রায় এক বছর পর সীমান্তের দুই পারে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে খুলনা জেলার বদলে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা পূর্ববঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই গুজবকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের মনে উদ্বেগ তৈরি হয় এবং শেষ পর্যায়ে এটা দাঙ্গাতে পরিণত হয়। জনসাধারণের এই ভোগান্তির জন্য উভয় দেশের সরকারকেই একমাত্র দায়ী করা যায়। কারণ এক বছর পরেও সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষদের মনে কেন প্রশ্ন থেকে গেল কোন কোন জেলা কোন দেশের মধ্যে পড়েছে। উভয় সরকার এর ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে ১৪-ই ডিসেম্বর নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে সমস্যার সামান্য কিছুটা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছিল। Radcliffe যখন এর খসড়া তৈরি করেন তখন তিনি মূলত কাগজের উপর ভিত্তি করে পূর্ব-প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার দ্বারা বিভাজনের চিহ্ন হিসেবে বড় নদী ও তার শাখা গুলি কে অনুসরণ করেছিলেন। তিনি যদি সশরীরে সীমান্তের এলাকাগুলি পরিদর্শন করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন বিভাজনের জমিনের চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এখানে একটা বিশাল বড় ঘটনা হলো যে বাস্তবের মাটিতে থানা বা জেলা গুলির মধ্যে বিভাজনের চিহ্নমাত্র ছিল না। আমরা যদি একটু গভীরে চিন্তা করে দেখি প্রশাসনিকভাবে যে বিভাজন বিভিন্ন নথিপত্রে চিহ্নিতকরণ হয়ে থাকে তা মূলত জরিপ ও বন্দোবস্ত মানচিত্রে, কিন্তু সেগুলোর বেশিরভাগেই সঠিক তথ্য থাকে না এবং তা বহুদিনের পুরনো হয়ে থাকে। Radcliffe লাইনের আরও বড় জটিলতা তৈরি করেছিল বাংলা বিভাজনের ক্ষেত্রে দুই ধরনের তথ্যকে ব্যবহার করার জন্য। একদিকে ভারতে আদমশুমারির তথ্য অনুসারে বিবেচনা করার জন্য 'থানা' কে 'ইউনিট' হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু বাস্তবে তিনি সীমান্ত নির্ধারণের সময় জরিপ ও বন্দোবস্তের মানচিত্র কে ব্যবহার করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে দুটোর মধ্যে অনেক সময়ে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলে উভয় দেশের প্রশাসনিকভাবে জটিলতা তৈরি হয়েছিল।[১৪] কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার এর জন্য হতদরিদ্র জনসাধারণকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। আজও ছিটমহলের দিকে নজর দিলে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ দেখতে পাই।

Radcliffe লাইনটিকে যদি আমরা প্রশাসনিক দলিলপত্র থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেখি তাহলে অন্য দৃশ্য নজরে আসে। Radcliffe লাইনের দ্বারা শত শত মাইল কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পৃথক করা হয়েছে তা বেশিরভাগই কৃষিজমির অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে গ্রামীণ সমাজের এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই লড়তে হয়েছে দিনের পর দিন ধরে। উভয় সীমান্তের পারের মানুষদের ক্ষেত্রে প্রায় একই চিত্র দেখা গেছে। তাদের বাড়ি থেকে সীমান্ত পার হয়ে চাষের জমি যাওয়া ও চাষ করা ফসল নিয়ে আবার সীমান্ত পার হয়ে আসার সময় বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এমন ঘটনারও নজির রয়েছে যে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীর গুলিতে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এই ধরনের নজির জয়া

চ্যাটার্জি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার গ্রন্থে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার এক হিন্দু ভাগচাষী তার এক জোড়া বলদ সীমান্ত পার করার সময় ওপারের বাহিনীরা কেড়ে নেয়, যা কখনো সে ফিরে পায়নি। কোচবিহার ও রংপুর, মালদাহ ও রাজশাহী এবং নদীয়া ও কুষ্টিয়া জেলাগুলির মধ্যে প্রায় উভয় পারের পুলিশদের দ্বারা গ্রামবাসিদের বহু জিনিস বাজেয়াপ্ত হয়, কখনো বা উভয় পারের গ্রামে প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা জানা যায়। এমনকি ১৯৫০ সালের মে মাসে এক সপ্তাহে ২৫০ টি গবাদিপশু চুরি হয়েছিল। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল এই ধরনের সীমান্তবর্তী এলাকাতে পুনরুদ্ধার করতে নতুন করে বহু সমস্যা তৈরি হয়।

বাংলা বিভাজনের পূর্বে সব সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে পারিবারিক, ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক ইত্যাদি প্রয়োজনে দৈনন্দিন যাতায়াত ছিল। এমনকি বাংলা বিভাজন হওয়ার পরও বেশ কয়েক বছর ধরে এই অবাধ যাতায়াত চলতে থাকে। কিন্তু সীমানা তৈরির ফলে তারা বহুভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সীমানা কমিশন সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের কর্মজীবন তথা কর্মভূমিতেও সীমারেখা টেনে দেয়। যারা সীমান্তের খুব কাছাকাছি রয়েছে সীমান্তের ঠিক ওপারে কিছু দূরে তাদের বড় বাজার বসতো। দেশভাগের পর তারা আগের মতো যেতে পারত না শুধু সীমারেখার কারণে। ওপার বাংলার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা দেখা যায়। যেমন রাজশাহী শহরের কাছাকাছি গ্রামগুলিতে শাক-সবজি, আলু, বেগুন, বিভিন্ন ডাল ইত্যাদি উৎপাদন হতো না অনাদিকাল থেকে। বহুকাল থেকেই মুর্শিদাবাদের পদ্মা নদীর দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামগুলি থেকে রাজশাহীর বাজারে মাল পাঠানো হতো। মুর্শিদাবাদে প্রচুর পরিমাণে এই ধরনের ফসলচাষ হওয়ার ফলে রাজশাহীর তুলনায় দাম অনেক কম হতো । মুর্শিদাবাদের গ্রামবাসীরা রাজশাহীতে গিয়ে শাক-সবজি বিক্রি করে উপার্জন করতো। কিন্তু দেশভাগের পর পদ্মা নদীতে বর্ডার লাইন তৈরি হওয়ার ফলে মুর্শিদাবাদের এই অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। অনেকে যখন বাংলা বিভাজনের পর বাধ্য হয়ে আগের কারবার করার চেষ্টা করে তখন তাদের অনেকের মালপত্র রাস্তায় চুরি হয়ে যেত বা কখনো আবার সীমান্তের উভয় দিকেই বাহিনী দ্বারা তারা শারীরিক ভাবে নিগৃহীত হতো। এরকম ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে।

এছাড়াও বাংলার বিভাজনে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরেছিল। আর ও একটা বড় ক্ষতি হয়েছিল তা হল দেশভাগের সময় উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। মালদা থেকে কলকাতা যেতে হলে বিহারের রাজমহল দিয়ে যেতে হতো যা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তাছাড়া মুর্শিদাবাদের একেবারে উত্তরপ্রান্তে ফারাক্কাতে গঙ্গা নদী অবস্থিত হওয়ার ফলে জলপথ ছাড়া উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। বাংলা ভাগের ঠিক পরেই আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশের সাথে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য 'Indian Tea Planters Association' রেল লাইন যুক্ত রোডের পরিকল্পনা দিয়েছিল সরকারকে এবং সরকার গুরুত্বের সঙ্গে সেটা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছিল।[১৫]

উত্তরবঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ জেলা হল মালদা জেলা। বাংলার এই জেলাটি প্রথমে

১৮৭৫-১৯০৫ পর্যন্ত এই জেলা বিহারের ভাগলপুর ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৫ সালে মালদা জেলা ভাগলপুর থেকে রাজশাহী ডিভিশনে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই জেলা ১৯৪৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত রাজশাহীতেই ছিল। ১৫- ই আগস্ট যখন স্বাধীন ভারতবর্ষে নতুন সূর্য উদিত হচ্ছে ঠিক তখনও এই জেলার মানুষ জানতে পারেনি তাদের দেশ পূর্ব-পাকিস্তান না ভারতবর্ষ।[১৬] ১৯৪৭ সালের ১৭-ই আগস্ট Radcliffe এর ঘোষণা অনুযায়ী ভারত বা বাংলার সাথে সাথে মালদা জেলারও বিভাজন করা হয়েছিল। এই জেলার পাঁচটি থানা শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল, গোমস্তাপুর এবং নবাবগঞ্জ পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল অন্যদিকে বাকি দশটি থানা ইংলিশ বাজার, মালদহ, গাজোল, হাবিবপুর, বামনগোলা, মানিকচক, রতুয়া, খরবা এবং হরিশ্চন্দ্রপুর নিয়ে তৈরি নতুন মালদা জেলা পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মালদা ভাগের ফলে অসংখ্য লোক পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে মালদাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মালদা বিভাজনের ফলে বড় ক্ষতি হয়েছিল রেশম চাষাবাদের। তার সঙ্গে হারাতে হয়েছিল চাষের উর্বর মাটিকেও। শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল, গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ এই পাঁচটি থানাতে উল্লেখযোগ্যভাবে ধান চাষ করা হতো এবং নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ ও ভোলাহাট ছিল ধান ব্যবসায়ীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। শিবগঞ্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল রেশম পোশাকের জন্য যা বাংলা জুড়ে খ্যাতি অর্জন ছিল। এইসব গুরুত্বপূর্ণ স্থান গুলো হারানোর জন্য এই জেলার রাজনৈতিক ও অর্থনীতির গুরুত্বও কমতে থাকে।[১৭]

বাংলা বিভাজনের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা হয়েছিল এবং তার সাথে শিকড়হীন ও বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছিল তাদের জন্ম ভিটেমাটি থেকে বা তাদের দেশ থেকে। অসংখ্য পরিমাণে বাস্তুচ্যুত মানুষ হয় সরাসরি আক্রান্ত হয়েছিলেন, না হয় কেউ আবার হিংসার ভয়ে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। যারা সীমানা পারাপার করেছিলেন তাদের বেশিরভাগেরই তখন উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্রয় গ্রহণ করা। আবার এও জানা যায় যে অনেককেই তাদের জন্মভিটে থেকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১৮] ভারতীয় উপমহাদেশে দেশভাগের যে ভয়াবহতা ফুটে উঠেছিল তা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করেছিল। বাংলা বিভাজনের সঙ্গে মালদা বিভাজন হওয়ার ফলে এই জেলাতে প্রচুর বাস্তুচ্যুত মানুষ নিজেদের পুনর্বাসন করেছিলেন। এই উদ্বাস্তু আগমনে মালদা জেলাতে একটা জনসংখ্যার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে এই উদ্বাস্তু আগমন শুধুমাত্র জনসংখ্যার হেরফেরই করেনি তার সঙ্গে আর্থ-সামাজিক পরিসরে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে দ্রুত নগরায়নের বৃদ্ধি ঘটেছিল এই জেলাতে। মুর্শিদাবাদ জেলার শোভেন্দ্রমোহন সেন উদ্বাস্তু আগমনের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও লেখক হিসেবে (ভারতবর্ষ, ৩৮বর্ষ, দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৫০) একটি সংবাদচিত্র উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পর থেকেই আশ্রয় প্রার্থীগণ মুর্শিদাবাদ আসতে থাকেন। ১৯৫০ সালে প্রায় এক লক্ষেরও অধিক উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মুর্শিদাবাদে আসতে থাকে। আশ্রয়প্রার্থীদের অনেকে নিজেরা কলোনি গড়ে তুলতে থাকে, তাতে সরকার কিছুমাত্র ঋণ মঞ্জুর করেছিল। বহরমপুর সদর ও লালবাগ মহাকুমাতে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল। তাছাড়াও

কাশিমবাজারের মনিন্দ্রনগর কলোনী, বলরামপুরের বলরামপুর কলোনি, কৃষ্ণমাটি, খিদিরপুর গ্রামেরও কলোনি গড়ে উঠেছিল। বহরমপুরের ভিতরে ও উপকণ্ঠে উদ্বাস্তুগন অনেক কষ্ট স্বীকার করেও মাথা গুঁজে ছিলেন। তাদের জীবন-যাপনের যে অসহনীয় চিত্র ফুটে উঠেছিল তা তুলে ধরেছেন বহরমপুরের প্রাবন্ধিক শোভেন্দ্রমোহন সেন, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থে। এদের বেশিরভাগই ঘরবাড়ি ফেলে আসা নিঃস্ব উদ্বাস্তু তবু তারা আত্মমর্যাদাবোধে কারো কাছে হাত পাততেন না, বাদাম, মুড়ি ইত্যাদি বিক্রি করে সামান্য রোজগার করতেন।

দীর্ঘদিনের পুরনো কমিশনার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিজয় কুমার গুপ্ত তাঁর-শ'তবর্ষের আলোকে বহরমপুরের পৌরসভা(১৯৭৮)'- প্রবন্ধে বলেছেন, ছিন্নমুল মানুষের ঢল সামলাতে পৌরসভা প্রবল চাপে পড়েছিল। ১৯৪৭-৫২ সময়ে বিভক্ত বাংলা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তে পরিবর্তন এনেছিল তার চাপ বহরমপুর শহর ও পৌরসভার উপর পড়েছিল। অসংখ্য উদ্বাস্তু এই শহরের আনাচে-কানাচে এবং শহরের প্রান্তদেশে এসে বসবাস শুরু করেছিল। তাতে পৌরসভার পরিচালকমণ্ডলী অনেকটাই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বহরমপুরের লিটল ম্যাগাজিন 'তমস'-এর ২০১৩ অক্টোবর সংখ্যায় মীর আনিসুজ্জামান এর একটি রচনায় ১৯৭১ সালে ইসলামপুর বাজার, কলাডাঙ্গা, নওদাপাড়ার চরের নিকটবর্তী ত্রাণশিবিরে আগত অসংখ্য নিঃস্ব নিরন্ন, দরিদ্র-ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের করুন চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য তৎকালীন সময়ে এগিয়ে এসেছিলেন ময়মনসিংহের কন্যা ও বহরমপুর গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা প্রীতি গুপ্ত। তিনি নিজে একটি 'মহিলা সমিতি' গড়ে তুলেছিলেন। মেঘনাথ সাহার 'ইস্ট বেঙ্গল রিলিফ সোসাইটি'-এর সঙ্গে এই সমিতি কাজ করত। এমনকি তিনি কলেজ ছাত্রীদের নিয়ে নাটকের চ্যারিটি শো করিয়ে সংগৃহীত অর্থে দুধ, ওষুধ ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী দুঃস্থ উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিলি করতেন। এছাড়া পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বহরমপুর শক্তি মন্দির, স্বর্গধাম সেবা সমিতি, রেডক্রস সোসাইটি, ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি।[১৯]

"মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ২০০৩" থেকে পাওয়া যায় স্বাধীনতা লাভের প্রায় চার বা পাঁচ বছর পর মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর গঠিত হয়েছিল। সেখানে দেখা গিয়েছে মুর্শিদাবাদে ১৯৪৬ সাল থেকে কাতারে কাতারে উদ্বাস্তুরা আসতে শুরু করেছিল। এই নবগঠিত দপ্তরে উদ্বাস্তুদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া, তাদের হাতে জমির দলিলপত্র তুলে দিয়ে বসবাসকে আইনসিদ্ধ করে দেওয়া, কলোনির উন্নতি সাধন ইত্যাদি চেষ্টা করেছিল।[২০]

ভারত বিভাজন তৎকালীন সময়ে কিছু সময়ের জন্য আপাতভাবে কিছু সমস্যার সমাধান করে দিলেও সুদূরপ্রসারী বহু সমস্যার জন্ম দিয়েছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে যে কাঁটাতারের সীমারেখা দেওয়া হয়েছিল তাতে অজস্র মানুষের জন্মভিটের স্মৃতিতে আঁচড় টেনে দিয়েছিল। পাঞ্জাবের সাথে সাথে তৎকালীন বাংলায় এই বিভাজনের কাঁটাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবন-যাপনকে আশঙ্কা ও আতঙ্কে পর্যবসিত করেছিল। বিশেষত মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা বিষয়টিকে আরো ঘোরালো করে তোলে। একদিকে যখন

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫-ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতার উৎসব উদযাপন নিয়োজিত ঠিক সে সময় এই দুই জেলার অসহায় মানুষরা তখনও আশঙ্কায় বিচলিত। এমনকি মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সেই সময় পাকিস্তানের পতাকাও উত্তোলন করা হয়েছিল। দেশ যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিল তাই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দুই জেলার বেশ কিছু জনসাধারণ ধরে নিয়েছিলেন যে তারা পাকিস্তানের অন্তর্গত। কিন্তু অনেক হিন্দু মুসলিম জনসাধারণ তা মেনে নিতে পারেননি। যার ফলে দুই জেলাবাসীর জনসাধারণকে অনিশ্চয়তায় দিন কাটাতে হচ্ছিল। তবে ১৮-ই আগস্ট দিল্লির সিদ্ধান্তে এই দুই জেলার ভারতে অন্তর্ভুক্তির সাথে সাথে সেখানে ভারতের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত জেলাবাসীদের সুদূরপ্রসারী সমাধান এনে দিতে পারেনি। এই কাঁটাতারের বেড়া তাদের প্রতিদিনের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। গৃহ থেকে ক্ষেত, বাড়ি থেকে বাজার, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট সবকিছু আলাদা করে দিয়ে তাদের মধ্যে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল আন্তর্জাতিক সীমানা। এই সীমারেখা তাদের বাসস্থান থেকে শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উপার্জনের ক্ষেত্রগুলি কে তফাত করে দিয়েছিল। এই তফাত মাপের ফিতেই অল্প হলেও বিষয়ের গাম্ভীর্যে তা আন্তরাষ্ট্রিক ব্যাপারে পরিণত হয়। দিন আনা দিন খাওয়া কৃষিজীবী, ছোটখাটো ব্যবসায়ী মানুষগুলো সেদিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দেশভাগের পরিনাম এই কাঁটাতারের বেড়া তাদের অস্তিত্বসংকটের মুখে ফেলে দিয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১ Yong ,Tan Tai and Gyanesh Kudaisya, The Aftermath of Partition in South Asia, (London and New York: Routledge, 2000), pp.81-85; Joya Chatterjee, The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-67, (New York: Cambridge University Press, 2007), pp.21-22.

২ Census of India, West Bengal, District Handbook Malda, 1951,

৩ Yong and Kudaisya, The Aftermath of Partition in South Asia, p.81.

৪ Chatterjee, Joya. The Spoils of Partition, pp.20-21.

৫ Chatterji, Joya. Partition Legacies, (Delhi: Suny Press, 2021), p.61.

৬ রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন- ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ, কলকাতাঃ দে'জ, ২০০৪, পৃ. ১০১।

৭ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর - পলাশী থেকে পার্টিশান, কলকাতাঃ ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৩, পৃ. ১৩০

৮ Chowdhury, Hamidul Huq. Memoirs, (Dhaka: Associated Printers Ltd, 1989).

৯ Chatterji, Partition Legacies, p.73.

১০ File no. E/0 320.954 B 436 b, Boundary demarcation, Bengal/1947?_/., National Library, Kolkata.

১১ ৬-ই জুন, ১৯৪৭, আনন্দবাজার পত্রিকা।

১২ Partition Proccedings, Vol.-VI

১৩ ২৬-ই জানুয়ারি, ২০১৬, আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৫-ই অগস্ট ২০১৯ ইটিভি ভারত; ১৮-ই অগস্ট ২০২০ আনন্দবাজার পত্রিকা।

১৪ Chatterji, Partition Legacies, pp.91-92.

১৫ Ibid, p.99-104.

১৬ West Bengal, Malda District Gazetteer, 1969, p.3
১৭ West Bengal, District Handbook Malda, 1951, p.72.
১৮ Chatterjee, The Spoils of Partition, p.105; Dipesh Chakroborty, 'Remembered Villages: Representation of Hindu Bengali Memoirs' in the Aftermath of the Partition, Economic and Political Weekly, Vol. 31, No 32, August, 10, 1996, p.2144; Ashim kumar Sarkar, Nationalism, communalism and partition in Bengal, Maldah, 1905-1953, Readers Service, kolkatta, 2013, p.162.
১৯ চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব- মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব ও দেশভাগের প্রভাব, বহরমপুর, আকাশ, ২০১৮, পৃ.-৪১-৫০।
২০ মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ২০০৩, পৃ.-৫৫১।

 ISSN-2319-8591

অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে বর্ণিত অন্ত্যজ সমাজজীবনের চিত্র

ড. সঞ্জয় পাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বাংলাসাহিত্য সৃষ্টির আদি লগ্নে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। চর্যাপদে অন্ত্যজ মানুষের কথা উল্লেখ আছে। মধ্য যুগেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্যগুলোতেও এই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকাল কল্লোল যুগে যে সমস্ত সাহিত্যিক সুনামের সঙ্গে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্ন শ্রেণির মানুষের কথা তাঁদের রচনায় তুলে ধরেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখ লেখকেরা অনেক গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন এই নিম্নশ্রেণিকে প্রাধান্য দিয়ে। হাঁড়ি, বাগদি, ডোম, মাঝি, মালো, শবর শ্রেণিভুক্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবন, তাদের সংস্কৃতি, তাদের চাওয়া পাওয়া, সুখ-দুঃখের ইতিহাস উপন্যাসের পরতে পরতে স্থান পেয়েছে। এমনই এক নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ' তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে সমগ্র মালো সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ জীবন চিত্র তুলে ধরেছেন। সেই বিষয়টি মূল প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

সূচকশব্দ : অন্তজ, সংস্কৃতি, সম্প্রদায়, স্পন্দন, বিপর্যয়, চর, অত্যাচার,

অদ্বৈত মল্লবর্মনের তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটি কালজয়ী বাংলা উপন্যাস। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের নিয়ে যে ক'টি উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে এটি অন্যতম। একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবনচিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। অন্তর মানুষের এই জনজীবন তিতাস নদীর কূলে লালিত এবং প্রতিপালিত। এদের পেটের খোরাকের যোগান দেয় তিতাস নদী, আর মনের খোরাকের যোগান দেয় এদের সংস্কৃতি। সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে তিতাস নদীর তীরবর্তী মালোরা বেঁচে থাকে। তিতাসের করুণাধারায় বেঁচে থাকা মালোদের সম্পদ, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। তাদের জীবন মরণ, বেঁচে থাকার দুটি প্রধান অবলম্বন একদিকে তিতাস নদীর অনুকূলতা অন্যদিকে তাদের প্রথা সংস্কারবদ্ধ সংস্কৃতি - এই দুটি তাদের এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে। তাই মানব জীবনের এই দুটি দিকই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। তাদের জীবনের একটা সামগ্রিক চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। তিতাসের স্রোতের সঙ্গে বয়ে যাওয়া মালোজীবনের পাকে পাকে জড়িয়ে আছে তাদের কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি। তিতাসের বুক শুকিয়ে গেলে, মালো সংস্কৃতিতেও ভাঙ্গন ধরে। বলা যায় তাদের মরণের দিন ঘনিয়ে আসে। ব্যক্তি চরিত্রকে বাদ দিয়ে একটা সম্প্রদায়ের

সামগ্রিক জীবনচিত্রের কথা ঔপন্যাসিক এখানে ব্যক্ত করেছেন। অন্ত্যজ সমাজের এই সামগ্রিক জীবনকে কোন দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে না দেখে, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মন নিয়ে, তাদের সুখ দুঃখকে উপলব্ধি করেছিলেন ঔপন্যাসিক। অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজে অন্ত্যজ সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন বলেই, তাদের উপলব্ধিকে এমন ভাবে উপন্যাসে চিত্রিত করতে পেরেছেন। মালোসমাজে যে মানুষটি ছোট থেকে বেড়ে উঠেছেন, যাঁর রক্তে মিশে আছে মালোদের সংস্কৃতি সংস্কার, যাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে মালোদের সুখ দুঃখের ইতিহাস সম্পৃক্ত হয়ে আছে, তিনি তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে উপন্যাসে বিবৃত করেছেন।

নদীর বুকেই তাদের বেড়ে ওঠা। নদীর সঙ্গেই তাদের নাড়ির টান। তাদের সুখ দুঃখের ইতিহাস জড়ানো। নদীর আনুকূল্যে জীবন আর নদীর প্রতিকূলতায় মৃত্যু। জন্ম মৃত্যু বিবাহকে কেন্দ্র করে মানুষের সাধারণ জীবন, এই বিশেষ অঞ্চলের প্রথা, সংস্কৃতির বর্ণনা, তিতাস নদীর সঙ্গে যেন তাদের আত্মীয়ের সম্পর্ক। নদীর অনুকূলতায় তাদের শান্তিময় জীবনযাত্রা। সে জীবনে দুঃখ দারিদ্র থাকলেও বাইরের জগতের কোন উৎপত্তি ছিল না। নাগরিক জীবনের সস্তা চটক ও কৃষিমতা এদের জীবনে যখনি দেখা গেল, তখনই নদীর বুকেও চর জেগে উঠলো, সেই সময়ই মালোরা তাদের জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেলল, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এত বৃহৎ আকারের মানুষদের নিয়ে, তাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে আর কোন ঔপন্যাসিক এমন ধরনের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি করতে পারেননি। তাই বলা যায়, এটি শুধু অনন্যতায় দাবি করে না, অন্তজ মানুষের মনের কথাকে স্পষ্ট করে তোলে।

তিতাস নদীর তীরে মালোদের জীবনযাত্রার উত্থান পতন,সুখ দুঃখময় জীবনের কথা এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। নদীর স্রোতের জোয়ার ভাঁটার মতই মালোদের জীবনে সুখ দুঃখের টানা -পোড়েন চলে। তিতাস নদীর জলস্রোত তিতাস তীরবর্তী মালোদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। তাই নদীর মরণের অর্থ এদেরও মরণ। উপন্যাসের প্রথমে দেখা যায়, সমাজের পায়ের তলায় পিষ্ট মানুষগুলির প্রতি তিতাস নদীর অসীম করুণা। সমাজের উঁচুতলার মানুষের দ্বারা যারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত, প্রকৃতিও যখন তাদের প্রতি নির্দয়। ঠিক তখনই তিতাস এদের সুখ দুঃখের সঙ্গী। এখানে যেমন সুখ আছে তেমন দুঃখ আছে, আবার দুঃখকে অতিক্রম করার পথও আছে। কিন্তু প্রকৃতি প্রতিকূল হলে মানুষের মতো নদীও অসহায় হয়ে পড়ে। তখন দুঃখ কে অতিক্রম করার আর কোন পথ তাদের কাছে থাকে না। তাদের বেঁচে থাকার আশ্বাসটুকুও কেউ দিতে পারে না। তিতাসের প্রাণ স্পন্দন তিতাস তীরের মানুষের যুগ যুগ ধরে এই ভাবেই বাঁচিয়ে রেখেছে। কথাকার নদীর সঙ্গে মানুষের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

তিতাস পারের সাধারণ মানুষের মতনই তিতাসের চরিত্র। তিতাস মাঝারি নদী। মেঘনা বা পদ্মার বিভীষিকা তার মধ্যে না থাকলেও -' তার কুল জোড়া জল, বুক ভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস।'

' দুষ্ট পল্লী বালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার ছোট নৌকায় ছোটবউ নিয়া মাঝি কোনওদিন ওপারে যাইতে ভয় পাই না।'

' তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মতো বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা

নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না।... তার তীরে বড় বড় নগরী বসানো নাই। সওদাগরের নৌকারা পাল তুলিয়া তার বুকে বিচরণ করিতে আসে না। ভূগোলের পাতায় তার নাম নাই।... ঝরনা থেকে জল টানিয়া পাহাড়ি কূলেদের ছুঁইয়া ছুঁই উপল ভাঙিয়া নামিয়া আসার আনন্দ কোনও কালে সে পায় নাই। অসীম সাগরের বিরাট চুম্বনে আত্মবিলয়ের আনন্দ ও কোন কালে তার ঘটিবে না।[১]

সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের ইতিহাসই হল তিতাস পারের ইতিহাস। নদীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাদের এই ইতিহাস- " মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম বউ ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে। সেই ইতিহাস কেউ জানে, হয়ত কেউ জানে না। তবু সে ইতিহাস সত্য। "[২] নদীকেন্দ্রিক অন্যান্য উপন্যাসের মতো তিতাস নিষ্ঠুর নয়। তিতাস পারের মালোরা যখন রাতবিরেতে জাল নিয়ে নদীতে যায়, তাদের ঘরের লোকেদের কোন চিন্তা থাকে না। মেঘনা পদ্মা বা গঙ্গার মতো ভীষণ নদীতে যেমন পাড় ভাঙ্গার ভয়, নৌকা ডোবার ভয়, কুমীরের ভয় - এখানে নেই।

নদীর চলার সঙ্গে মানব জীবনের চলার ছন্দকে লেখক মিলিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে যে মানুষগুলি জলের জীব, জলের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ - নদীর কৃপণতা-অকৃপণতায় তাদের জীবনে আসে সুখ দুঃখ, নদীর জোয়ার ভাঁটার মত তাদের জীবনেও আসে হাসি কান্নার জোয়ার ভাঁটা। নদী যখন বর্ষার জলে পুষ্ট হয়, মালদের জীবনও সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। চৈত্রের খরার দিনে নদীর জল যখন শুকিয়ে যায়, মালোরাও যেন কেমন হয়ে যায়। তিতাস নদীর তীরের বাসিন্দারা নদীর করুণায় অনেক সুখী। খরার সময় বৈশাখ মাসে বাউল বাতাস যখন বৃষ্টি ডেকে আনে, তখন মাঠ-ময়দানের জলধারা তিতাসে গিয়ে মেশে। জলের রং পরিবর্তিত হয়। কাদা জলে মাছেরা অন্ধের মত জেলেদের জালে ধরা দেয়। জেলেদের আনন্দের আর সীমা থাকে না।

ঔপন্যাসিক উপন্যাসে তিতাস নদীর তীরবর্তী মালোদের যে জীবন চিত্র অঙ্কন করেছেন তা রূপকথার মতই। এদের জীবনে সমৃদ্ধি না থাকলেও সুখ আছে। এদের জীবনযাত্রা তেমন আধুনিক জীবনের মত জটিল নয়। তাই অনন্তর মাকে গোকর্ণ ঘাটের বাসিন্দারা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পেরেছিল। কালোবরণের মা সস্তায় ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। গ্রামের অন্যান্য বধূরা তাকে ভালো মনেই গ্রহণ করেছিল। সুবল আর বউ তাকে জীবিকা অর্জনের পথ দেখিয়েছিল। এমনকি সামাজিক বৈঠকেও তাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। অতীতে কি করেছিল তা নিয়ে কারোর মাথাব্যথা বা কোন সংশয় বা কোন সন্দেহ ছিল না। বরং এ গ্রামে একজন নতুন বাসিন্দা এসেছে খবরটা যারাই পেয়েছিল তারাই খুশি হয়েছিল। সহজ সরল সমাজ ব্যবস্থার চিত্র এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়।

নদীর তীরবর্তী মালোদের জীবনযাত্রায় উচু নিচু ভেদাভেদ থাকলেও জেলে কৃষক এই নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদও এখানে ছিল না। কাদির ও বনমালির আচরণের মধ্যে, রামপ্রসাদ বাহারুল্লার আলাপচারিতার মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। কাদিরের আলুর নৌকা যেদিন ডুবে যাওয়ার হাত থেকে ধনঞ্জয় ও বনমালী বাঁচিয়েছিল। সেদিনই জেলে নৌকার প্রশস্ত জায়গাতে

বোঝায় হয়েছিল কাদিরের আলু। কাদির বনমালী একই নৌকার ছইয়ের নীচে। কাদিরের সাদা দাড়ি বেয়ে জল পড়ে বনমালীর গায়ে। কাদির বনমালীর কাঁধে পড়া জল মুছে দেয়। বনমালীর ভালো লাগে। কোথায় যেন তার সঙ্গে যাত্রা বাড়ির রামপ্রসাদের সাদৃশ্য আছে। হয়তো এই দাড়িটিই সাদৃশ্যের কারণ। তার মনে হয়েছে, রামায়ণ মহাভারতের মুনি ঋষিদের উত্তরাধিকারী যেমন রামপ্রসাদ তেমনি মিয়াদের পীর পয়গম্বরের মত কাদির মিয়া। সে উপলব্ধি করেছে -' বাস্তবিক যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদ, বিরামপুর গাঁয়ের এই কাদির মিয়া - এরা এমনি মানুষ,যার সামনে হোঁচট খাইলে হাত ধরিয়া তুলিয়া অনেক কাঁটা ঘেরা পথ পার করাইয়া দিবে।'

সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ অর্থাৎ অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের পারস্পরিক বিভেদের রূপটি এই উপন্যাসের দু এক জায়গায় ধরা পড়েছে। ভরতের বাড়ির সামাজিক বৈঠকের চেহারাটি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে -

'উঠান জুড়িয়া পাল খাটানো। মাঝখানে উত্তম বিছানায় বসিয়াছে পাড়ার গণ্যমান্য লোক কয়জনা। তাদের সবাই বড় - কেউ টাকার জোরে, কেউ গায়ের জোরে, ভাইয়ের জোরে, কেউ বুদ্ধির জোরে। তবে যাদের বিচারবুদ্ধি বা উপস্থিত কিংবা কথার প্যাঁচ খাটানো প্রতিভা আছে, সকল বৈঠকে তাদের প্রাধান্য। ...আসরের চারিধারের আর যত সব নরনারায়ণ তারা কেবল কথা শোনার লোক, তামাক টানার লোক।'

বৈঠকের মানুষজনের মধ্যে একজন হল তামসীর বাবা। বৈঠকের কোন কথায় তার কানে পৌঁছায় না। সে আত্মমগ্ন, তার চিন্তা চেতনার মধ্যে সে ডুবে আছে। সে জানে তার কথা বৈঠকে উঠবে, সে অপরাধী, তার বাড়িতে কায়েতদের আনাগোনা, সেও স্বীকার করে নিয়েছে যে সে অপরাধী। সে ভেবেছে পাড়ার মধ্যে ঐক্য রাখা ও পাড়ার স্বার্থ দেখায় প্রথম কাজ। মালোদের ঐক্য নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। তাদের মধ্যে একতা আছে। তাই তারা ' যেখানে যায়, আ - পথে পথ হয়, আ - বাজারে বাজার হয়।' তামসীর বাবা এই একতা ভাঙতে চলেছে। ওইসব লোকেদের সম্পর্কে জানে -'... তারা আমার কে? তারা মালোদের ঘরে নেয় না, মালোরা কোনও জিনিস ছুঁইলে সে জিনিস তারা অপবিত্র মনে করে।পূজা -পার্বনে মালোরা তাদের বাড়ির প্রসাদ খাইলে এঁটো পাতা নিজে ফেলিয়া আসিতে হয়। সে পাতা ওরা ছোঁয় না, জাত যাইবে। এরা মালোদের কত ঘৃণা করে। মালোরা লেখাপড়া জানেনা, তাদের মতো ধুতি চাদর পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া বেড়ায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তারা ছোঁওয়ারও অযোগ্য? মালোরা মালো বলিয়া কি মানুষ নহে।' প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঔপন্যাসিক নিজে ওই সাম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্য, বেদনাটি আরো বেশি করে ফুটে উঠেছে।

তামসীর বাবার এই ভাবনাটিও ঠিক। কিন্তু তার করার কিছু নেই। দয়ালচাঁদ তাকে বুঝিয়েছে -

'ভাবিয়া দেখ, কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না। তুমি মালোই থাকিবে। তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসন দাও, তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দিবে ভাঙ্গা তক্তায়। তুমি রুপার হুকাতে তামাক দিলেও, তোমাকে দিবে শুধু কলকে খানা ।'

সমাজের এই ভেদাভেদের রূপ খুব জটিল। সমাজে এই ছোট বড়কে মাপা হয় বিভিন্ন

মাপকাঠিতে। কখনো বর্ণ, কখনো অর্থ, কখনো গায়ের জোরে, কখনো সম্প্রদায়গত ভাবে। এখানেও বিভিন্ন ধরনের চিত্র রয়েছে। যারা গায়ের জোরে বা টাকার জোরে বা বুদ্ধির জোরে বলীয়ান বলে পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তি তারাই জোর খাটিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। এটা সমাজের এক চিরাচরিত প্রথা। বলবান দুর্বলের ওপর চিরদিনই অত্যাচার করে। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই সে চিত্র আমরা দেখতে পাই। এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। রামপ্রসাদ গায়ের মাতব্বর হয়েও বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে পারেনি, সে ক্ষেত্রে অবশ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চক্রবর্তীর পুরোহিত দর্পণের প্রভাব ছিল। সে ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ মালো অতি ক্ষুদ্র। মাতব্বর হলেও সে তো নিচু জাতের। সমাজের এই চিত্রটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। আজকের সমাজেও সমভাবে বিদ্যমান।

একটা বিষয় আমাদের ভাবিয়ে তোলে যে, মানুষ নিয়ে গঠিত সমাজ অথচ সামাজিকতার ক্ষেত্রে এই অসাম্য। অসাম্য নতুন কোন ব্যাপার নয়, মানুষের উৎপত্তির সময় থেকেই এমন ভাবেই চলে আসছে। এর সমাধান হয়তো হবেও না এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান বক্তব্য আমরা স্মরণ করতে পারি -

"... সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের ওপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া। "[৩]

হিন্দু - মুসলমান, উচ্চ -নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র এই সামাজিকতার মুখোশ আমাদের পরে থাকতে হয়। দেখা যায় অন্তজ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হলেও অনেকেই এ ব্যাপারে নিরাসক্ত। তিতাসের সমাজেও দেখা যায় কাদীর মিয়া এই ব্যবধান কে স্বীকার করে নিলেও কাদির পুত্র সেই ব্যবধান মানতে পারেনা। সে অনেক বেশি সচেতন অনেক বেশি আত্মমর্যাদা বোধ পূর্ণ।

তিতাস তীরবর্তী মালোদের সমস্যার আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাদের নিজেদের বৈঠকে আলোচিত- বাজার বসিয়ে জমিদারের তোলা আদায়ের ব্যাপারটি। অন্তজ মানুষদের প্রতিবাদের একটি অভিনব পন্থা লেখক তুলে ধরেছেন-

'মনের অসন্তোষ বাহিরে প্রকাশের ভাষা হয়তো ইহাদের আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাহীন জীবনে সাহসের স্বভাব- সুলভ অভাব-ই ইহাদিগকে যুগে যুগে দাবাইয়া রাখে। তাই ইহারা আগাইয়া আসিয়া সরবে মনের আলোড়নকে ভাষা দিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস হারাইলেও অন্যায়কে এরা কোন যুগেই হজম করিয়া নেয় না। তাই কালে কালে দেশে এরা আগাইয়া সামনে আসিতে না পারিলেও এই অব্যক্তর দল প্রতিবাদ ঠিক জানায়। কোথাও হারিয়া, কোথাও কাঁদিয়া, কোথাও শিষ দিয়া। আবার কোথাও তৈজসপত্র ভাঙ্গিয়া বা দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ও কেরোসিন সিক্ত বস্ত্রাঞ্চলে দেশলাই কাঠি ধরাইয়া। গোকর্ণ ঘাট গ্রামের মালোদের সাধারণ স্তরের লোকেরা মাতব্বরের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল সেদিন হুকা টানিবার ছলে অনেকে একসঙ্গে কাসিয়া।'

পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে তৈরির অনুষ্ঠানে যখন একের পর এক প্রস্তাব চলে, তখন সুবলের বউ এর মুখে সুবলের মৃত্যুর করুণ কাহিনি শুনতে পাওয়া যায়-'... কালোবরণের বড় নৌকায় করিয়া জিয়লের ক্ষেপ দিতে গিয়েছিল। সুবল বলিয়াছিল আমাকে ভাগীদার হিসেবে নেও। তারা বলিয়া ছিল নৌকা আমাদের পুঁজি আমাদের

ভাগীদার হিসাবে নিব কেন? মাসিক বেতন দিব। শুনিয়া সুবলের বউ বলিয়া ছিল, তবে গিয়া কাম নাই। কিন্তু বিবাহ করিয়াছে, লোকজন খাওয়াইয়াছে। হাতের টাকা করি খরচ হইয়া গিয়াছে। সামনে দুরন্ত আষাঢ় মাস। এই দুঃসময় সে নিজে কি খাইবে বউকে কি খাওয়াইবে। কাজেই বেতনধারী হইয়া না গিয়াই বা কি করে।'

মালোদের সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তিতাসের বুকে চর দেখা দেয়। মানুষ সমাজ দু'রঙা প্রজাপতির মত ভেঙে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। দ্বিধাবিভক্ত সমাজে একতার অভাবে মালো সম্প্রদায়কে দুর্বল থেকে আরও দুর্বলতর করে তোলে। সবলের অত্যাচার মাথা পেতে নিতে হয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জোর তারা হারিয়ে ফেলে। গ্রামীণ ধনী ব্যক্তি কর্তৃক মালোদের ওপর অত্যাচার, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায়, আসল আদায়ের জন্য তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চলতে থাকে। তারা ঘটি বাটি, সূতা-হাঁড়ি, জালের পুঁটলি নিয়ে পথে বসে পড়ে। চরের জমি নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটে। তিতাসের বুকে জেগে ওঠা মাটির দখল নিতে চায় কৃষকেরা। একতার অভাবে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায় না। দুর্বল মালোদের মুখে শোনা যায়-

'গাঙ শুখাইয়া জল গিয়াছে, তার সঙ্গে আমরাও গিয়াছি, এখন মাটি নিয়ে কামড়াকামড়ি করিতে আমরা যাইব না।'

সেদিন যারা প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল তারা আর ফিরে আসেনি। করমালী ও বন্দে আলীর মত ভূমিহীন চাষীও মার খেয়ে এসেছিল। যারা তিতাসের বুকে ভেসে ওঠা জমির মালিকানা পেল তাদের টাকার জোর অনেক বেশি।

এই বিপর্যয়ের ফলে অনেকেই সপরিবারে গ্রাম ছাড়ে। যে গ্রামে এতদিন তারা ভালোভাবে জীবন যাপন করে এসেছে, আজ তারা পথের ভিখারিতে রূপান্তরিত হয়। যে মানুষ সমাজ এতদিন তিতাসের করুণায় টিকে ছিল, ভৌগোলিক বিবর্তনের ফলে তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। মালোদের অবস্থা সত্যিই জল ছাড়া মাছের মত হয়। তাদের জীবন- নদীতে জোয়ার ভাটা পড়ে। অনেকে মারা যায় অনেকে বেঁচে মরে থাকে। এভাবেই ঔপন্যাসিক তাঁর নিজ চিন্তা ভাবনাকে উপন্যাসের পরতে পরতে গ্রন্থিত করেছেন।

সূত্রনির্দেশ

১. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, ১ম প্রকাশ শ্রাবণ- ১৪০৩, পৃষ্ঠা -১৩-১৪
২. তদেব, পৃষ্ঠা -২৬
৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার, কালের প্রতিমা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭১, পৃষ্ঠা -১৮৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. কায়সার, শান্তনু, অদ্বৈত মল্লবর্মণ: জীবন সাহিত্য ও অন্যান্য, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭
২. ঘোষ, বিনয়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮
৩. চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত, বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ ২০০২
৪. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ- ১৪০৩, পৃষ্ঠা ১৩- ১৪
৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার, কালের প্রতিমা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল- ১৯৭১

 ISSN-2319-8591

খেলাধূলার ইতিহাসে প্রতিস্পর্ধী বাঙ্গালীদের ভূমিকা

রাসবিহারী জানা

PHD গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

আধুনিকখেলাধুলার ইতিহাসে বাঙালির বীরত্ব গাথা আজ কোন নতুন কথা নয়। যা শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক পর্বে ব্রিটিশদের দেওয়া দুর্বলতার অপবাদের তকমা ঘোচাতে। সেদিনের সেইবাংলায়অর্থাৎ ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বজাতির অপমান ঘোচাতে কেবল সুস্থ স্বাভাবিক বাঙালিরাই শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করেন নি, এর পাশাপাশিবহু প্রতিস্পর্ধী বাঙালিরাও সেই শরীরচর্চার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। তবে এই সকল প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরা কেবল ঔপনিবেশিক পর্বেই নয়, ঔপনিবেশিকত্তোর পর্বেও অন্যান্য বীরত্ব সম্পন্ন বাঙ্গালীদের মত ফুটবল, ক্রিকেট, অলিম্পিক সহ একাধিক আধুনিক খেলায় অংশগ্রহণ করে স্বদেশের মান মর্যাদাকে শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু এই সকল বীরত্ব সম্পন্ন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিবর্গদের ক্রীড়া ইতিহাস আজপর্যন্ত সেভাবে বাংলার খেলার ইতিহাসের পাতায় উঠে আসেনি। অথচ এরা কিন্তু, কেউ সহানুভূতি নিয়ে নয়, স্ব-কৃতিত্বে সফল হয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসে আড়ালে থাকা এই সকল ব্যক্তিদের খেলাধুলার ইতিহাসকে আজ আমি এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে তুলে ধরব।

সূচকশব্দ: প্রতিস্পর্ধী, ক্রিকেট, ফুটবল, প্যারা- অলিম্পিক, সাঁতার, দাবা।

একবিংশ শতকের বাংলায় আজও যেসকল তথাকথিত সভ্য ব্যক্তিগণ সমাজে অত্যাচারিত, অবহেলিত, অবদমিত, নিপীড়িত ও শোষিত প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিবর্গদের, মুখ ,বধির, দৃষ্টিহীন কিংবা ভিন্নভাবে সক্ষম এইসব সভ্য সমাজের শব্দবন্ধ ব্যবহারের পরিবর্তে কানা, খোড়া, বোবা এইসব নিম্ন রুচি সম্পন্ন শব্দবন্ধ দিয়ে চিহ্নিত করে থাকেন, তাদের কাছে যে আজ, এইসকল ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিবর্গদের ক্রীড়া ইতিহাসচর্চা কিছুটা হাস্যকর ও কিছুটা অতিরঞ্জিত সম্পন্ন অলীক কল্পনা বলে মনে হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভিন্নভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েরা যে, খেলতে পারেন- এ বিষয়টি আজ অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। অথচ বিশ্বের ক্রীড়া মঞ্চে বহুবার বহু বাঙালি প্রতিস্পর্ধী খেলোয়াড় ভারতবর্ষের মান মর্যাদা রক্ষা করেছেন ও এখনো রক্ষা করে চলেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো কেউই আমরা তার খোঁজ রাখি না, রাখবার উৎসাহও দেখাইনা। যে কারণে ১৯৮০-র দশক থেকে ভারতবর্ষে সুস্থ স্বাভাবিক সক্রিয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত মানুষের ক্রীড়া (ক্রিকেট, ফুটবল, অলিম্পিক প্রভৃতির) ইতিহাসচর্চা বহুলভাবে শুরু হলেও, প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের খেলার ইতিহাসের বইয়ের পাতা, আজও অনেকটাই শব্দহীন ধবধবে সাদা

রয়ে গেছে। এর ফলস্বরূপ বাঙালি প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিবর্গদের ক্রীড়া ইতিহাস আজ যেন কুয়াশাচ্ছন্ন দিনের আলোয় কোন অজানা পথে হারিয়ে, নিরব নিরালায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি জাতির ইতিহাস নাই বলিয়া আক্ষেপ করে বলেছিলেন "বাংলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাংলার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখব, সকলেই লিখিবে।"[১] অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু বাঙালীদের উপরই তার স্বজাতির ইতিহাস রচনার গুরুদায়িত্ব আরোপ করেছিলেন। সেইহেতু একজন ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার গবেষক হয়ে প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের ক্রীড়া ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা এই গবেষণায় তুলে ধরা হল। তবে, মূলত এই প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর বাংলার প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরা কিভাবে ও কোন প্রেক্ষিতে শরীরচর্চার পাশাপাশি বিশ্বমঞ্চের ক্রীড়ার আঙিনায় এসে স্বজাতি এবং স্বদেশের মান মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তারা কতটা সফল হয়েছিলেন সেই বিষয়গুলিকেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, এখানে জেনে বুঝে যথাযথ যুক্তিসম্মত শব্দ, 'প্রতিবন্ধী' ব্যবহারের পরিবর্তে 'প্রতিস্পর্ধী' কথা ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ প্রতিবন্ধী শব্দটি কার্যক্ষেত্রে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিবর্গদের কোন একটি প্রতিবন্ধকতার দিক তুলে ধরে। অন্যদিকে প্রতিস্পর্ধী শব্দটির অর্থ (অমরকোষ অনুযায়ী) হল যিনি প্রতিযোগিতা করেন। যার সমার্থক শব্দ হলো প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী ও স্পর্ধী। যেহেতু ক্রীড়ার মধ্য দিয়ে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিবর্গদের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিস্পর্ধার মনোভাবের দিকটি পরিস্ফুটিত হয়। সেহেতু এর মধ্য দিয়ে তারা প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। যে কারণে আমার এই শব্দ চয়ন। তবে এই প্রতিস্পর্ধী শব্দটি আমি যে প্রথম ব্যবহার করছি তা নয়, এর আগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী কর্তৃক এই শব্দটি সম্ভাব্য প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ২০১৩ সালে। সেই সময় থেকে তারা 'প্রতিস্পর্ধী বার্তা'[২] নামে এক পত্রিকাও প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। ইতিপূর্বেও বাংলার এই ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিবর্গদের ইতিহাস গবেষক বুবাই বাগ তার পি.এইচ.ডি গবেষণায় আলোচনা করেছেন।[৩] দেবাশীষ জানা[৪] এম.ফিল গবেষণায় পশ্চিমবাংলার এইসকল প্রান্তিক ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে ইতিহাস চর্চা করেছেন। তবে এদের গবেষণায় আর্থসামাজিক,রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবাংলার প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান ও তাদের শিক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হলেও প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের শরীরচর্চা, ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ এবং সাফল্যের বিষয়টি সেভাবে আলোচিত হয়নি। যে বিষয়টিকে এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের ক্রীড়াচর্চার আদি ইতিহাস

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিবর্গদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ ও তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের বলবীর্য প্রদর্শন ও মান মর্যাদা উন্নয়নের বিষয়টি আজ কোনো অভিনব ঘটনা নয়। যার শুভ সূচনা হয়েছিল সুদূর প্রাচীনকালে। যেখানে আমাদের চিহ্নিত করা সুস্থ স্বাভাবিক বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় অধিবাসীদের পাশাপাশি প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরাও ভিন্ন ভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের বলবীর্য সহ যুদ্ধক্ষেত্রে ও রাজ্যর রক্ষার্থে

শৌর্যবীর্যের প্রমান দিয়েছিলেন। যার নিদর্শন আমরা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সহ বহু প্রাচীন সাহিত্য থেকে পাই। প্রাচীন ভারতে জনপ্রিয় খেলাগুলি ছিল তীরন্দাজি, মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, সাঁতার, অশ্বদৌড়, দাবা, পাশা প্রভৃতি। মহাভারতে অর্জুনের তীরন্দাজি ও ভীমের গোদার নিপুণতার কথা আমরা প্রায় সবাই জানি কিন্তু এই মহাভারতেই বর্ণিত প্রাচীন ভারতের প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্র ও শকুনির ক্রীড়া চর্চার বিষয়টি আমরা অনেকেই জানিনা। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন একজন দৃষ্টিহীন প্রতিস্পর্ধী রাজা। যিনি তার দৃষ্টিহীনতা সত্বেও এক খ্যাতমান মুষ্টিযোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন। মহাভারত থেকে জানা যায় এই প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তি প্রায় ১০০ টা হাতির সঙ্গে একাই লড়াই করতে পারতেন।[৫] অপরদিকে শকুনি ছিলেন একজন অস্থি প্রতিস্পর্ধী। যিনি তার পায়ের কার্যহীনতার অভাব অন্তর থেকে সরিয়ে দিয়ে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পাশা খেলায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।[৬] সেসময় যার জুড়ি মেলা ছিল বেশ দায়। প্রাচীন ভারতের এই প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তি শকুনি কেবল পাশা খেলায় নয়, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পাশা খেলার মত নতুন চাল চেলে যুদ্ধের ক্রিয়াকলাপকে এক অন্য মাত্রা প্রদান করেছিলেন।[৭] সুতরাং প্রাচীন ভারতে যৎসামান্য হলেও প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরা যে, ক্রীড়াচর্চায় অংশগ্রহণ করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মধ্য যুগের ভারতবর্ষে প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরা ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতেন কিনা সে সম্পর্কিত তথ্য এখনো আমাদের কাছে অধরা থাকলেও আধুনিক ভারতে বিশেষ করে ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর বাংলায় প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের ক্রীড়াচর্চার নানান সূত্র পাওয়া যায়।

ঔপনিবেশিক বাংলায় শারীরিক উৎকর্ষতা সাধনে প্রতিস্পর্ধী

এখন প্রশ্ন হবে বিশ্ব মঞ্চে খেলাকে কেন্দ্র করে সুস্থ স্বাভাবিক ভারতীয় খেলোয়াড়রা যেভাবে ও যে প্রেক্ষিতে, সে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ব্যায়াম চর্চাই হোক কিংবা ক্রিকেট, ফুটবল অথবা অলিম্পিকই হোক বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সময় স্বজাতির মানমর্যাদা রক্ষা ও স্বদেশের মানকে শীর্ষ স্থানে তোলার পাশাপাশি নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক উৎকর্ষতার প্রমাণ রেখেছিলেন, ঠিক সেই একইরকম ভাবে কি ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালি প্রতিস্পর্ধী খেলোয়াড়রা বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনে, স্বজাতির মান রক্ষায় হোক কিংবা শারীরিক বা বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষতা তুলে ধরার ক্ষেত্রেই হোক সমান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন? এককথায় উত্তর দিলে উত্তরটা হবে হ্যাঁ। কারণ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ কর্মচারী বিশেষ করে মেকলে ও হরাটিও স্মিথের বহুল ব্যঙ্গাত্মক ও কুরুচিকর কথায় (বাঙ্গালীদের হাত-পা বাঁকা,[৮] বাঙালিরা দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ ও বাঙালিদের খেলা ওঠা আর বসা[৯] প্রভৃতি) কুপোকাত হয়ে সেইসময়কার স্বাবলম্বী, সুস্থ-শারীরিক-সক্রিয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত বাঙালিরা নিজেদের মান মর্যাদা রক্ষা ও ব্রিটিশ কতৃক অপমান মোচনের জন্য, ঠিক যেমনভাবে শারীরিক উৎকর্ষতাসম্পন্ন ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন আখড়া, ব্যায়ামশালা ও বিভিন্ন ধরনের খেলার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্রিটিশদের সম্মুখ সমরে লড়াই করতে নেমেছিলেন[১০]; ঠিক একইভাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সত্যিকারের প্রকৃত ব্যাহত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যুক্ত বিকলাঙ্গ প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরাও শারীরিক আন্দোলনের উৎকর্ষতা

সম্পন্ন ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে বাঙালিদের উপর বসে যাওয়া কাপুরুষতা ও দুর্বলতার মতো অপমানজনক তকমা ঘোচাতে সমানভাবে সামিল হয়েছিলেন। তবে একথা ঠিক, ১৯১১ সালের মোহনবাগানের শিল্ড জয়ের মতো সেই পর্বে হয়তো প্রতিস্পর্ধী বাঙালিরা ব্যায়ামচর্চায় অংশগ্রহণ করে জাতীয় আন্দোলনে সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি,তা স্বত্ত্বেও এই বিষয়টিকে বাংলার সমাজ রাজনীতির ইতিহাসে একেবারে ছোট করে দেখা যায় না। কারন তৎকালীন বাংলার সমাজে এই প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের শরীরচর্চা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং এই বিষয়টি ভদ্রলোকদের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসাও পেতে শুরু করেছিল।এমনকি বহু সংস্থা ও ক্লাব প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের এই শরীরচর্চা প্রদর্শনের আয়োজন করতেও শুরু করেছিল। সে খবরগুলি বিশ শতকের গোড়া থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সুন্দরভাবে প্রায়শই তুলে ধরা হত। যেমন হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় 'ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল'- এর দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা কলকাতা টাউন হলে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ড্রিল প্রদর্শন করে সেদিন শরীরচর্চার নিদর্শন রেখেছিল[১১]। দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের এই শরীরচর্চা প্রতিস্পর্ধী ছাএসমাজে ব্যাপকভাবে আলোড়ন ফেলেছিল এবং তা শরীরচর্চার আন্দোলনের এক পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ আমরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের শরীরচর্চা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। যেমন ১৯৩০ সালে কলকাতা হোমিওপ্যাথিক হসপিটালে প্রতিস্পর্ধী ছাত্রদের জন্য শরীরচর্চার এক ডেমোস্ট্রেশন এর আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে আপার সার্কুলার রোডে ক্যালকাটা ডিফ এন্ড ডাম্ব স্কুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা হয়েছিল স্যার পি. সি. রয় এর সভাপতিত্বে[১২]। এছাড়া এই ডিফ এন্ড ডাম্ব স্কুল আবার বেঙ্গল বাস্কেটবল লীগ প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণ করেছিল। যেখানে এই স্কুলসহ কলকাতার অন্যান্য স্কুল কলেজ অংশগ্রহণ করেছিল। তবে বলে নেওয়া ভালো যে সেই প্রতিযোগিতায় নির্দিষ্ট একটি ম্যাচে এই ডিফ এন্ড ডাম্ব স্কুল বয়'স ট্রেইনিং স্কুল এর কাছে ৪৪-৪ বিশাল এক ব্যবধানে পরাজিত হলেও প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের এই প্রতিস্পর্ধী ক্রীড়াস্বরূপ মনোভাব নিয়ে কেউ সেদিন ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করেননি। বরং বাহবা দিয়েছিল[১৩]। এর পাশাপাশি আবার বিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায় ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুলের আরো একটি শরীরচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায় গভর্মেন্ট হাউজে। যেখানে মিসেস ক্যাসে (দ্যা মেট্রোপলিটন অফ ইন্ডিয়া), মিস্টার জাস্টিস বিশ্বাস, মাস্টার ডন কাসে এবং মিস জিন কাসে- র উপস্থিতিতে দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা আরবিক গান সহ ওয়ার্ড ড্রিল, এরোপ্লেন ব্যায়াম, প্যারামিডস, ব্রতচারী এবং বাইরের বিভিন্ন খেলার প্রদর্শন করেছিলেন[১৪]।

প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের যে ক্রীড়াচর্চা ঔপনিবেশিক বাংলায় ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়েছিল, তা ঔপনিবেশিকোত্তর বাংলায়ও সমানভাবে প্রচলিত ছিল। যেমন Calcutta Blind School (1894), Calcutta Deaf and Dumb School (1893), Lighthouse For The Blind (1941), Ramakrishna Mission Blind Boys Academy (1958), Vivekananda Mission Ashram Resident for Blind (1978), louis Braille Memorial School প্রভৃতি বিদ্যালয় বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খেলার শিক্ষক নিয়োগ করে প্রতিস্পর্ধী ছাত্রছাত্রীদের সকাল সন্ধ্যা

বিভিন্ন ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরচর্চার বিষয়টিকে সচল রেখেছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার বন্দোবস্তও করেছিলেন। এরকমই একটি প্রতিস্পর্ধীদের শরীর চর্চার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। যিনি তার আত্মকথাতে লিখেছেন একশো নম্বর গড়পার রোডে তাদের বাড়ির পশ্চিম পাশে ছিল মুখ বধির স্কুল প্রতিদিন বিকেল বেলায় মুখ বধির ছেলেমেয়েরা মাঠে খেলা করত। যা তিনি তিনতলার ছাদ থেকে উপভোগ করতেন। তিনি বলেছেন "আসল দেখার ব্যাপার হত বছরে একবার, স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টসের দিন।"[১৫] বিদ্যালয়গুলির এই স্বতস্ফূর্ত উদ্যোগের ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রতিস্পর্ধী ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ধরনের খেলায় পারদর্শী হয়ে ওঠার পাশাপাশি বিশ্বমঞ্চে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া অনেক প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তি ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য বরাদ্দ স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ না করেও আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনেক নজির রেখেছিলেন। যার প্রমাণ আমরা বিশ্ব ক্রীড়া মঞ্চে তাদের সর্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শন ও সাফল্যের নজির থেকে পাই।

ঔপনিবেশিকোত্তর পর্বে বিশ্ব মঞ্চে বাংলার প্রতিস্পর্ধী

ঔপনিবেশিকোত্তর বাংলায় (পশ্চিমবঙ্গ) প্রতিস্পর্ধী খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বল্লভপুর গ্রামের বাসিন্দা মাসুদুর রহমান বৈদ্য (১৯৬৮- ২০১৫)। যিনি ছিলেন একজন অস্থিপ্রতিস্পর্ধী উদ্যমী খেলোয়াড় যার শৈশবে এক ট্রেন দুর্ঘটনার কারণে দুই পদযুগল হাঁটুর নিচ থেকে বাদ পড়ে যায়। এই উদ্যমী বাঙালি প্রতিস্পর্ধী জীবনের সঙ্গে লড়াই করে দেশে ও বিদেশের মঞ্চে একজন সফল সাঁতারু হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এশিয়া তথা বিশ্বের সর্বপ্রথম শারীরিক প্রতিস্পর্ধী সাঁতারু যিনি ১৯৮৯ সালে পুনে আর্টিফিশিয়াল লিম্ব সেন্টার আয়োজিত সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১৭ টি প্রতিযোগিতার মধ্যে ১৬ টিতেই প্রথম স্থান অধিকার করে এক রেকর্ড গড়েছিলেন। বিশ্বমঞ্চেও তার রেকর্ড ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। বাংলার এই প্রতিস্পর্ধী সাঁতারু বিশ্বের একমাত্র সাঁতারু হয়ে হাঁটুর নিচ থেকে পাহীন অবস্থায় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে এশিয়ার 'প্রথম প্রতিবন্ধী সাঁতারু' হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল এবং ২০০১ খ্রিস্টাব্দে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ২০১০ সালে পক্ প্রণালীও অতিক্রম করেছিলেন।[১৬] শচীন টেন্ডুলকারের কথায় যিনি ছিলেন 'Real Hero'।[১৭] বাংলার এরকম আরেকজন শারীরিক একপদ নিষ্ক্রিয় অস্থী প্রতিস্পর্ধী সাঁতারু হলেন হাওড়ার সালকিয়ার বাসিন্দা রিমো সাহা। যিনি প্রতিস্পর্ধী ভারতীয় হিসেবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অনেকগুলি রেকর্ড গড়ে ভারতবর্ষের মান মর্যাদার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। হাওড়ার এই প্রতিস্পর্ধী সাঁতারু ২০১৮ সালের জুন মাসে প্রথম রিলে প্রথায় ইংলিশ চ্যানেল ও ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাটালিনা দ্বীপ থেকে শুরু করে লস এঞ্জেলেস র‍্যাঞ্চো পালো ভার্দেস পর্যন্ত ২০.২ মাইল বা প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব মাত্র ৩ দিনের ব্যবধানে দুবার পার করে নজির গড়েছিলেন। শুধু তাই নয় ২০২২ সালে ইউরোপের নর্থ চ্যানেল জয় করে ভারতের পতাকাকে শীর্ষস্থানে তুলে ধরে ছিলেন বাংলার এই প্রতিস্পর্ধী। যা তার সাফল্যের মুকুটে এক নতুন পালক যোগ করেছিল।[১৮] প্রতিস্পর্ধী এই খেলোয়াড়ের উদ্যমী যাত্রা আজও

থেমে নেই। একের পর এক নজির সৃষ্টি করতে বিশেষ প্রয়াস গ্রহণ করে চলেছেন। রিমো সাহা কেবল একজন খেলোয়াড় রূপে নয় তিনি একজন সাঁতারু প্রশিক্ষক রূপেও কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে চলেছেন। তারই নিজের হাতে গড়া ছাত্র মিনাখার বাসিন্দা আহম্মদ গাজী টানা পাঁচ দিন (১২০ ঘণ্টা) সাঁতার কেটে লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলেছেন।[১৯] এর পাশাপাশি অলিম্পিকে পদকজয়ী আরো কয়েকজন বাঙালি প্রতিস্পর্ধীর নাম করা যায়। যারা বিশ্বমঞ্চে ভারতবর্ষের পতাকাকে শীর্ষস্থানে তুলেছিলেন। যেমন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শ্রীরামপুরের সাগরিকা হাজরা। যিনি ছিলেন মুখ বধির সংক্রান্ত একজন প্রতিস্পর্ধী। বাংলার এই লড়াকু প্রতিস্পর্ধী ২০০৭ সালে সাংঘাই এ অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক ওয়ার্ল্ড সামার গেমস্-এ সাঁতার প্রতিযোগিতায় একটি করে সোনা ও রুপার পদক জিতেছিলেন।[২০] এর পাশাপাশি এই স্পেশাল অলিম্পিকে বাংলার প্রতিস্পর্ধী নন্দীগ্রামের চিন্ময় মিদ্যা সাঁতারে দুটি রুপা এবং একটি ব্রোঞ্জ, সিঙ্গুরের মানসী সামন্ত অ্যাথলেটিক্সে রুপা ও ব্রোঞ্জ, কোন্নগরে রাজু ঘোষ ক্রিকেটে ব্রোঞ্জ ও রঞ্জন দত্ত ভলিবলে সোনা, এস কে সাহেব হ্যান্ডবলে ব্রোঞ্জ এবং সন্তু নেগাল ফুটবলে ব্রোঞ্জ জিতে দেশের মান মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন।[২১] প্রতিস্পর্ধীদের এই খেলাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য সর্বপ্রথম ১৯৯২ সালে Physically Handicapped Sports Federation of India প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা পরবর্তীকালে Paralympic Committee of India নামে রূপান্তরিত হয়। তবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এই খেলাগুলি সাধারণত Department of Youth Services and Sports -এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

কমনওয়েলথে বাঙালি দৃষ্টিহীন

সাঁতারসহ অলিম্পিকের পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায়ও বাংলার প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের সাফল্য ছিল বেশ আশানরুপ। যেমন ২০১৯ সালে বারমিংহামের ওয়ালসালে প্যারা জুডো প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। সেই প্রতিযোগিতায় ভারত থেকে ২০ সদস্যের দল যোগ দিয়েছিল। যেখানে পশ্চিম বাংলার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একজন আংশিক দৃষ্টিহীন প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তি বুদ্ধদেব জানা ৬০ কিলোগ্রামের কম ওজনের বিভাগে অংশগ্রহণ করে ব্রোঞ্জ পদক জয় লাভ করেছিলেন যা ভারত তথা বাংলার গৌরবকে এক নতুন স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল। বাংলার এই আংশিক দৃষ্টিহীন প্রতিস্পর্ধী যুবক ছিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমির ছাত্র। যেখানে তিনি দিব্যেন্দু হাটুয়ার প্রশিক্ষণে জুডো অনুশীলন করতেন। প্যারা কমনওয়েলথ গেমসে তার প্রথম লড়াই হয়েছিল আলবেনিয়ার খেলোয়াড়ের সঙ্গে। সেই ম্যাচে আড়াই মিনিটের মধ্যে অতি সহজেই বুদ্ধদেব জয়লাভ করেছিলেন। প্রতিপক্ষদের মধ্যে স্কটল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধীরাও ছিলেন। যদিও কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন দেশীয় প্রতিপক্ষ রোহিতের সঙ্গে। তবে বুদ্ধদেব কোয়ার্টার ফাইনালে দেশীয় প্রতিস্পর্ধী প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেও সেমিফাইনালে আরেকজন দেশীয় প্রতিস্পর্ধী প্রতিপক্ষ কপিল পারমার- এর কাছে পরাজিত হন। অবশেষে ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে হয়েছিল শ্রীলংকার প্রতিস্পর্ধী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। যেখানে তিনি খুব টানটান উত্তেজনা সম্পন্ন ম্যাচে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করেছিলেন।[২২]

বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলার দৃষ্টিহীনরা

প্রতিস্পর্ধী খেলোয়াড়দের আরেকটি আন্তর্জাতিক স্তরীয় জনপ্রিয় খেলা হলো ক্রিকেট। যেই খেলা সাধারণ ক্রিকেটের থেকে একটু আলাদা। দৃষ্টিহীনদের এই খেলায় সাধারণ ক্রিকেট খেলার মত প্রত্যেক দলে ১১ জন করে সদস্য থাকে তবে এই সদস্যদের বন্টন হয় তিন ভাগে। প্রথম ভাগে থাকে চার জন, B1 (সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন) যারা এক স্কোর করলে দুই হয়ে যাবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনদের প্রাপ্ত স্কোরের দলগত স্কোর দ্বিগুণ হয় এবং এক ড্রপের পর ক্যাচ ধরলেও ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যায়। দ্বিতীয় ভাগে থাকে তিনজন B2 (অতি ক্ষীনকায় দৃষ্টিমান), তৃতীয় ভাগে থাকে চারজন B3 (B2 থেকে একটু দৃষ্টিমান অর্থাৎ আংশিক দৃষ্টিমান)। B1- এর মত B2 কিংবা B3- এর প্রাপ্ত স্কোর দ্বিগুণ হয় না এবং এক ড্রপের পর বল ক্যাচ ধরলেও ব্যাটসম্যান আউট হয় না। এই খেলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সাধারণভাবে এই ক্রীড়া শব্দযুক্ত বল-এ খেলা হয়ে থাকে। যে বলের শব্দের দ্বারা দৃষ্টিহীন খেলোয়াড়রা বলের গতিবিধি অনুসরণ করেন। কখনো ফিল্ডিং খাটার সময় কখনো বা ব্যাট করার সময় এই শব্দ দ্বারাই তারা আন্দাজ করে বল ধরতে কিংবা বলকে বাউন্ডারির ও ওভার বাউন্ডারি পাঠাতে সচেষ্ট হন।[২৩] খেলোয়াড়রা স্পর্শ করে স্টাম্পের স্থান বোঝেন এবং প্লেয়াররা শব্দ করে স্ব স্ব স্থান জানান দেন। দৃষ্টিহীনদের এই ক্রিকেট খেলা ১৯২৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার আকারে সর্বপ্রথম শুরু হলেও আন্তর্জাতিক স্তরে এই ক্রীড়া মর্যাদা পেয়েছিল ১৯৯৮ সালে বিশ্বকাপ আয়োজনের মধ্য দিয়ে। যা হয়েছিল ৪০ ওভারের একদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এ পর্যন্ত দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ পাঁচ বার আয়োজিত হয়েছে। যার মধ্যে ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০০২ সালে পাকিস্তান, ২০০৬ সালে পাকিস্তান এবং ২০১৪ ও ২০১৮ সালে ভারত সাফল্য লাভ করে। তবে টি-টোয়েন্টি দৃষ্টিহীন ক্রিকেট বিশ্বকাপে প্রথম থেকেই জয়ের ধারা দৃষ্টিহীন ভারতীয়রা বজায় রেখেছে। ২০১২ ও ২০১৭ -এর মত ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতীয় দৃষ্টিহীনরা জয়ের হ্যাটট্রিক করে ভারতবর্ষের মান মর্যাদার শ্রী বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন।[২৪]

ভারতবর্ষের এই দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেটকে সুন্দরভাবে সংগঠিত ও পরিচালনা করার জন্য ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Association for Cricket for the Blind in India. যা ২০১০ সালে Cricket Association for the Blind in India (CABI)-এ রূপান্তরিত হয়। ভারতবর্ষে এই সংগঠন বিভিন্ন রাজ্য থেকে দক্ষ খেলোয়াড়দের নিয়ে ভারতবর্ষের দল তৈরি করে থাকেন। সেখানে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের দৃষ্টিহীন ক্রিকেট সংগঠনগুলি অন্যতম ভূমিকা পালন করে। যেমন পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন দৃষ্টিহীনদের বিদ্যালয় সহ ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত Visually Impared Cricket Association of Bengal এবং Cricket association for the Blind of Bengal বহু দৃষ্টিহীন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সংগঠিত করে এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাদের দক্ষতা প্রমাণে সুযোগ করে দিয়ে আসছেন। এর ফলে পশ্চিমবাংলা থেকে অনেক দৃষ্টিহীন খেলোয়াড় ভারতীয় ক্রিকেট দলে জায়গা করে

নিয়েছেন। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সন্তোষ সাহানি, হুগলি জেলার তারকেশ্বরের লক্ষ্মী নারায়ন অধিকারী, সুরজিৎ ঘোরা ও শুভেন্দু মাহাতো। এদের মধ্যে এস সাহানি ভারতে আয়োজিত ১৯৯৮ সালে কনিষ্ক বিশ্বকাপে[২৫] এবং এল. এন অধিকারী ১৯৯৮ কনিষ্ক বিশ্বকাপ এবং ২০০২ সালে পেট্রো বিশ্বকাপে[২৬] ভারতীয় দৃষ্টিহীন ক্রিকেট দলে এক বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে এই দুজন বাঙালি দৃষ্টিহীন খেলোয়াড় বিশ্বকাপ বিজয়ের স্বাদ না পেলেও সেই বিজয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের বাসিন্দা সুরজিৎ ঘোরা ২০১৮-১৯ দৃষ্টিহীন ক্রিকেট বিশ্বকাপে। দৃষ্টিহীনদের সেই বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল পাকিস্তান। যে বিশ্বকাপে ভারত এবং পাকিস্তান অন্য দেশগুলিকে পরাজিত করে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সেই ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল দুবাইয়ের সার্জায়ে। সেদিনের সেই দর্শক সম্পূর্ণ গ্যালারি ও টানটান উত্তেজনা সম্পন্ন ম্যাচে ভারত তার প্রতিপক্ষ টিম পাকিস্তানকে দুই উইকেটে পরাজিত করে জয়লাভ করে বিশ্বকাপ ঘরে এনেছিল। আর সেই বিজয়দলে ছিল বাংলার গর্বের ছেলে সুরজিৎ ঘোরা। তার কথায় "সেদিন আমার এক অন্য অনুভূতি হয়েছিল, বাঙালি হিসেবে বিশ্বকাপের স্বাদ পেয়ে আমি খুব গর্বিত।"[২৭]

দৃষ্টিহীনদের একদিনের বিশ্বকাপের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও বাঙালি দৃষ্টিহীনদের দাপট ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০২২ সালে দৃষ্টিহীনদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। যে বিশ্বকাপে অন্যতম কান্ডারী ছিলেন পশ্চিমবাংলার ঝাড়গ্রাম জেলার সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন প্রতিস্পর্ধী অধিবাসী শুভেন্দু মাহাতো।[২৮] যিনি ফাইনাল ম্যাচটি আঘাত জনিত সমস্যায় খেলতে না পারলেও ২০২২ সালে বিশ্বকাপ বিজয় ও ভারতবর্ষের গৌরবকে বিশ্বের মঞ্চে ছড়িয়ে দিতে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার সাফল্যে ঝাড়গ্রাম জেলার সকল অধিবাসী ব্যাপকভাবে আনন্দিত, অভিভূত, আপ্লুত, ও আহ্লাদীত হয়েছিলেন। এমনকি সম্পূর্ণ আদিবাসী সমাজ শুভেন্দু বাড়ি ফিরতেই প্রাক মকর সংক্রান্তির উৎসবেও মেতে উঠেছিলেন।[২৯] যদিও দুঃখের কথা হল আজ পর্যন্ত কোন বাঙালি দৃষ্টিহীন প্রতিস্পর্ধী কন্যা ভারতীয় মহিলা দৃষ্টিহীন ক্রিকেট টিমে জায়গা করে উঠতে পারেনি তবে সেই দুঃখ কিছুটা হলেও ঘুচিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম চিলকার একজন অতি সাধারণ দরিদ্র পরিবারের দৃষ্টিহীন প্রতিস্পর্ধী কন্যা সংগীতা মেট্যা দৃষ্টিহীনদের ফুটবল খেলায় কৃতিত্ব স্থাপনের মধ্যে দিয়ে।

বিশ্ব ফুটবল মঞ্চে বাঙালি দৃষ্টিহীন ছেলে ও মেয়েরা

দৃষ্টিহীনদের এই ফুটবল খেলা সাধারণ ফুটবল খেলা থেকে একটু আলাদা। এই খেলায় প্রত্যেক দলে পাঁচজন করে খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে খেলতে পারেন। যার মধ্যে চারজন হবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন (B1) বাকি একজন থাকবে গোলরক্ষক তিনি হবেন সম্পূর্ণ দৃষ্টিমান কিংবা আংশিক দৃষ্টিহীন (B2 কিংবা B3)। এই খেলা সাধারণত শব্দযুক্ত ফুটবলে খেলা হয়ে থাকে। বলের সেই শব্দ শুনে দৃষ্টিহীন খেলোয়াড়রা বলের গতিবিধি অনুমান করেন। তাছাড়া গোলপোস্টের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতার ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য থাকে। দৃষ্টিহীনদের এই ফুটবল খেলায় গোলপোস্টের উচ্চতা হয় ২.১৪ মি এবং দৈর্ঘ্য হয় ৩.৬৬ মি। এরমধ্যেই জালে বল জড়িয়ে গোল দিতে হয়। দৃষ্টিহীনদের এই ফুটবল খেলা অনেকটা আঘাত

জনিত দিক থেকে ভয়ঙ্কর হলেও খেলাটা কিন্তু বেশ মজার। এই খেলা পরিচালনা করার জন্য ভারতবর্ষে The Indian Blind Football Federation (IBFF) ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বাংলায় দৃষ্টিহীন ফুটবলারদের একই মঞ্চে আনার জন্য ২০১৭ সালে সংগঠিত হয়েছিল Football Association for the Blind of Bengal (FABB) যার সহযোগিতায় বাংলা থেকে অনেক দৃষ্টিহীন প্রতিস্পর্ধী ভারতবর্ষে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ফুটবল খেলায় জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাংলার দৃষ্টিহীন প্রতিস্পর্ধী কন্যা সঙ্গীতা মেট্যা। যিনি আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে বেশ নাম কামিয়েছেন। ২০২৩ সালে বার্মিংহামে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিহীন ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ভারত সেমিফাইনালে হেরে গিয়ে চতুর্থ স্থান অর্জন করে। সেই টুর্নামেন্টে বাংলার হয়ে প্রতিমা ঘোষ ও সংগীতা মেট্যা ভারতের ফুটবল দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। ভারতীয় সেই দল সঙ্গীতার নেতৃত্বে সম্পূর্ণভাবে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও সেদিন এই বাংলার মেয়ে সবার দৃষ্টি কেড়েছিল। [৩০] যা সংগীতার জন্য ছিল অতুলনীয় পাওনা। এরপরই ২০২৪ সালে ভারত জাপান দৃষ্টিহীন ফুটবল সিরিজে সংগীতা সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেখানেও ইন্ডিয়া ২-০ সিরিজে জাপানের কাছে পরাজিত হয়।[৩১] তবে বাংলার এই উদ্যমী প্রতিস্পর্ধী কন্যা আজ থেমে নেই, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলার দৃষ্টিহীন মহিলা ফুটবলারদের পাশাপাশি দৃষ্টিহীন পুরুষ ফুটবল খেলোয়াড়াও আজ থেমে নেই। বাংলার এই পুরুষ ফুটবল খেলোয়াড়দের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১২ সালে দৃষ্টিহীন গৌতম দে-র হাত ধরে। ২০১৩ সালে অভিজিৎ মন্ডল এবং গৌতম দে প্রথমবারের মতন নিজেদের তৈরি দল নিয়ে ভারতের হয়ে থাইল্যান্ডের আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন। ইন্ডিয়ান ব্লাইন্ড ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে ২০১৭ সালে তৈরি হয় বেঙ্গল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ফর দা ব্লাইন্ড। ফুটবলের সঙ্গে দৃষ্টিহীন গৌতম মন্ডল উত্তরবঙ্গে ক্রিকেটারদের জন্য তৈরি করেন কলকাতার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দা ব্লাইন্ড ইন বেঙ্গল। বিভিন্ন জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা তথা ভারতের এই দৃষ্টিহীন ফুটবল দল সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতিটি মুহূর্তে এই দলের পাশে দাঁড়িয়েছেন একটি রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকের সিইও।[৩২]

বিশ্বমঞ্চে দাবা খেলায় দৃষ্টিহীনরা

আউটডোর গেমের মত ইন্ডোর গেমেও বিশেষ করে দাবা খেলায় বাংলার বহু প্রতিস্পর্ধী গন অনেক সাফল্যের নজির গড়েছেন। এই দাবা হল ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী খেলা যা বংশ পরম্পরায় আজও চলে আসছে। এই ক্রীড়াকে কেন্দ্র করে বিশ্বমঞ্চে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পাশাপাশি প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরাও ভারতের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছেন। এই দাবা খেলাকে সুন্দর সংগঠিত করার জন্য এবং বিশ্বমঞ্চে দৃষ্টিহীন দাবা খেলোয়াড়দের উৎসাহ প্রদান করার জন্য ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল All India Chess Federation for the Blind। এই দাবা হল এমন এক খেলা যে খেলায় সুস্থ সবল স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা অনায়াসেই সুন্দরভাবে খেলতে পারেন এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা সুকৌশলের প্রমাণও দিতে পারেন। এরকম নজির ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক

রয়েছে। যেমন আংশিক দৃষ্টিহীন আজাহার আলাম কলকাতায় আয়োজিত সুস্থ স্বাভাবিক মানুষসহ দৃষ্টিহীনদের এক দাবা প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক একজন মানুষকে হারিয়ে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছিলেন। [৩৩] তবে এই ব্যক্তি বিশ্বমঞ্চে না যেতে পারলেও লক্ষ্মী নারায়ণ অধিকারী ২০০৩ সালে বিশ্বমঞ্চে তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। যিনি স্পেনে আয়োজিত বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন টুর্নামেন্টে ৮৭ জন বিশ্বের খেলোয়াড়ের মধ্যে ১১ নম্বর স্থান অর্জন করে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার ও সাফল্যের এক মাইলফলক পুতে দিয়েছিলেন। [৩৪]

পরিশেষে বলা যায় বাংলার এইসব প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিবর্গরা নানান বাধা পেরিয়ে ভারত তথা বাংলার মর্যাদাকে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে দিলেও তারা আজও এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে বিশেষ সম্মান পায়নি। বাংলার এই সব খেলোয়াড়রা অধিকাংশ সময়ই আর্থিক অনটনের শিকার হয়েছিলেন। যারা বর্তমানে আছেন তারাও আজ একই কষ্ট ভোগ করে চলেছেন। যেমন সাগরিকা হাজরা আজ মায়ের সঙ্গে মাদুর বোনেন। প্যারা অলিম্পিকে পদকজয়ীচিন্ময় মিদ্যা ও মানসী সামন্তের আজ আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। তাছাড়া মাসুদুর রহমান যিনি বাংলার মর্যাদা কে সর্বপ্রথম বিশ্বস্তরে তুলে ধরেছিলেন তিনিও জীবনের শেষ বেলায় আর্থিক কষ্টে ব্যাপকভাবে ভুগেছিলেন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। এমনকি তিনি জানিয়েছিলেন বিশেষ স্পনসরের অভাবে তার অনেক জায়গায় সমুদ্র যাত্রাও বন্ধ হয়েছিল। আজ এটি ভাবতে খুব কষ্ট লাগে , যে দেশে অন্যান্য সুস্থ স্বাভাবিক খেলোয়াড়রা সে ক্রিকেট ফুটবল খেলোয়াড়ি হোক কিংবা অন্যান্য খেলায় পারদর্শী ব্যক্তি হোক, তারা যে সম্মান পান সেই সম্মান বাংলার অন্যান্য প্রতিস্পর্ধী খেলোয়াড়রা পাননা। তাদের দিকে ফিরেও দেখা হয় না। আমি চাই তাদের এই স্বপ্ন জয়ের লড়াইয়ের ইতিহাস সবার সম্মুখে আসুক। তাহলে প্রতিস্পর্ধীদের খেলা সম্পর্কে সাধারণ লোকসহ সমাজের সভ্যলোকেরা সচেতন হবেন ও তাদের প্রতিস্পর্ধা সম্পর্কে জানবেন। এর ফলস্বরূপ প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিদের ক্রীড়া টুর্নামেন্টের জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে এবং বাংলার প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিরা ক্রীড়াচর্চায় আরো উৎসাহ পাবেন।

সূত্রনির্দেশ

১. সেন, প্রবোধ চন্দ্র, বাংলার ইতিহাস সাধনা, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড ১৯৫৩, পৃষ্ঠা. ২৮।

২. মুখার্জি, অনির্বাণ, (সম্পা.), প্রতিস্পর্ধী বার্তা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী। ২০১৩

৩. বাগ, বুবাই, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবন্ধী মানুষ (১৯৪৭-২০১২): প্রান্তিকতার নানা দিক, পিএইচডি থিসিস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।

৪. জানা, দেবাশীষ, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা: প্রসঙ্গ ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল, এম ফিল থিসিস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,2022।

৫. Kumari, Neha, 'Karmic Philosophy and the Model of Disability in Ancient India', International Journal of Arts, Science and Humanities, 2019, p. 41.

৬. তদেব।

৭. তদেব।

৮. Macaulay, T.B, 'Warren Hastings', Critical and Historical Essays', Vol.3, London,1843, p 345.

৯. Smith, Horatio, 'Bengali Games and Amusements', Calcutta Review, 1851, p-339.

১০. Mitra, Soumen, In search of an Identity history of Football in Colonial Culcutta, Dusgupta,2006. এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক, খেলা যখন ইতিহাস, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৪।
১১. Hindu Patriot, 12 April, 1915.
১২. The Bengali, 27 December, 1930.
১৩. The Statesman, 5 September, 1935.
১৪. Amrit Bazar Patrika, 5 December, 1944.
১৫. রায়, সত্যজিৎ, যখন ছোট ছিলাম, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশনী, ১৯৯২ পৃষ্ঠা ২০।
১৬. Times Of India,26 April, 2015. (https://timesofindia.indiatimes.com/sports/off-the-field/double-amputee-swimmer-masudur-rahman-baidya-passes-away/articleshow/47059966.cms Accessed on: 01/05/2024.)
১৭. Times Of India ,18 December, 2014, (https://timesofindia.indiatimes.com/sports/more-sports/others/sachin-tendulkar-overwhelmed-by-masudur-rahman-baidyas-achievements/articleshow/45565334.cms Accessed on: 01/05/2024.)
১৮. আনন্দবাজার অনলাইন ,22 September, 2022, (https://www.anandabazar.com/sports/bengal-swimmer-remo-saha-crossed-north-channel-dgtld/cid/1371601 Accessed on: : 01/05/2024)
১৯. এইসময় ,21 December, 2018, (https://eisamay.com/west-bengal-news/disabled-swimmer/amp_articleshow/67183224.cms Accessed on: : 01/05/2024)
২০. The Telegraph online , 29 November 2007 (https://www.telegraphindia.com/west-bengal/girl-swims-across-sea-of-odds-for-gold/cid/1570931 Accessed on: 01/05/2024)
২১. The Telegraph online , 13 October 2007 (https://www.telegraphindia.com/sports/sagarika-s-feat/cid/1071709 Accessed on: 01/05/2024)
২২. আনন্দবাজার অনলাইন 6 November, 2019, (https://www.anandabazar.com/amp/sports/buddhadeb-jana-won-bronze-medal-in-para-judo-commonwealth-games-1.1067501 Accessed on: : 01/05/2024).
২৩. Blind Cricket England and Wales, Official Record (https://bcew.co.uk/international/international-blind-cricket-rules/ Accessed on: 01/05/2024).
২৪. The Indian Express 19 December, 2022, (https://indianexpress.com/article/trending/trending-in-india/indian-national-blind-cricket-teams-winning-moment-at-t20-world-cup-8331086/ Accessed on: 01/05/2024).
২৫. (https://i.imgci.com/db/ARCHIVE/1998-99/OTHERS+ICC/WC-BLIND/SQUADS/WC-BLIND_NOV1998_IND-SQUAD.html Accessed on: 01/05/2024)
২৬. (https://www.espncricinfo.com/story/blind-cricket-indian-probables-announced-123280 Accessed on: 01/05/2024).
২৭. সাক্ষাৎকার, সুরজিৎ ঘোরা, আয়োজনে- রাসবিহারী জানা, তারিখ- ০২/০৫/২০২৪।
২৮. এইসময় 26 December, 2022. (https://eisamay.com/west-bengal-news/others/jhargram-cricketer-suvendu-mahato-returning-his-village-after-winning-t20-world-cup/articleshow/96521712.cms Accessed on: : 03/05/2024).
২৯. তদেব।
৩০. The Times of India 25 August, 2023. (https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/international-blind-games-bengal-girls-help-india-finish-before-germany-eng/articleshow/103037825.cms Accessed on: 03/05/2024).
৩১. The Statesman 21 February, 2024. (https://www.thestatesman.com/bengal/

blind-footballer-from-state-returns-after-series-in-japan-1503271633.html Accessed on: 03/05/2024).
৩২. আজকাল 3 May, 2024. (https://www.aajkaal.in/story/6623/sangeeta_of_bengal_got_a_chance_in_india-japan_women_039_s_blind_football_series Accessed on: 03/05/2024).
৩৩. সাক্ষাৎকার, আজাহার আলাম, আয়োজনে- রাসবিহারী জানা, তারিখ ০২/০৫/২০২৪
৩৪. The Telegraph online, 14 November, 2004. (https://www.telegraphindia.com/jharkhand/light-glows-from-within/cid/703106 Accessed on: 03/05/2024).

 ISSN-2319-8591

বাংলা চলচ্চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : এক কিংবদন্তি বাঙালি অভিনেতা

সুরাট সরকার
গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, স্বাধীন গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,
বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশন

সারসংক্ষেপ

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাঙালির প্রতিভা বিশ্বজোড়া স্বীকৃত। সহস্রাব্দেরও অধিক প্রাচীন বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস আজও তার ঐতিহ্য ধরে রেখে আধুনিক বিশ্বসমাজে উজ্জ্বল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলা ও বাঙালি জাতি দেশ তথা পৃথিবীকে দিয়েছে নব নব ভাবনা। বাঙালি জাতির সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস যেমন সুগভীর তেমনি সুবিস্তৃত। বাংলা সাহিত্য প্রাণে আনে নতুন আলোকের সঞ্চার। বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিনোদনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বাংলা চলচ্চিত্র। বাংলা চলচ্চিত্রে যেমন ফুটে উঠেছে বাঙালির সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক, তেমনি ধরা পড়েছে বাঙালির সংস্কৃতি, বাংলার রীতিনীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি। কীই বা এমন আছে যা এই চলচ্চিত্রে ফুটে ওঠেনি? বাঙালির ইতিহাস, বাঙালির আচার- অনুষ্ঠান, হাসি- কান্না, সংগ্রাম, আবেগ- অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা; এক কথায় বাঙালির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের সমস্ত চিত্রই এখানে জায়গা করে নিয়েছে। এই বাংলা চলচ্চিত্র হলো বাঙালির জীবনের এক দর্পণ, এক প্রতিফলন। এই বাংলা চলচ্চিত্রে বিভিন্ন বিষয়কে সুন্দর অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে ধরেছিলেন যে সমস্ত অভিনেতা- অভিনেত্রীরা তাদের মধ্যে অন্যতম সেরা একজন হলেন বাংলার কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয় বাংলা চলচ্চিত্র কে করেছিল নবজীবন দান। করে তুলেছিল আরও বেশি আকর্ষণীয়, আরও প্রাণবন্ত। তাঁর অভিনয়ে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছিল বাংলার গ্রামীণ জীবনের অভাব- অনটনের চিত্র, অন্যদিকে তেমনি সন্ধান মিলেছিল শহুরে ব্যস্ততার মধ্যে জীবনের রসদ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা চলচ্চিত্র কে নিয়ে যান দর্শকের আরো সন্নিকটে, দর্শককে নিয়ে আসেন বায়োস্কোপের সামনে। এই প্রবন্ধে আমরা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর চলচ্চিত্র জীবন, বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করব।

সূচক শব্দ : বাংলা, বাঙালি, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র, অভিনয়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্রের ইতিহাস অতি প্রাচীন। চলচ্চিত্র এক প্রকারের দৃশ্যমান বিনোদন মাধ্যম। চলমান চিত্র তথা 'মোশন পিকচার' কথাটি থেকে চলচ্চিত্র শব্দটি এসেছে। বাংলায় চলচ্চিত্রের প্রতিশব্দ হিসেবে ছায়াছবি, সিনেমা, মুভি বা ফিল্ম শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়।

বাস্তব জগতের চলমান ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে ধারণ করে কাল্পনিক জগত তৈরি করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে ডিসেম্বর তারিখে প্যারিস শহরে লুমিয়ার ভ্রাতৃদ্বয় তাদের তৈরি ১০ টি ছোট ছোট চলচ্চিত্র প্রথমবারের জন্য বাণিজ্যিকভাবে উপস্থাপন করেন। বাংলা ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রকেই বলা হয় বাংলা চলচ্চিত্র। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বাংলাদেশেও বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দাদাসাহেব ফালকে নির্মিত 'রাজা হরিশচন্দ্র' ছিল প্রথম পুর্ণাঙ্গ ভারতীয় চলচ্চিত্র। এটি ছিল একটি নির্বাক চলচ্চিত্র। বাংলার সর্বপ্রথম পুর্ণাঙ্গ নির্বাক চলচ্চিত্র ছিল 'বিল্বমঙ্গল'।[১] বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্রকে 'টলিউড' বলা হয়। এই শব্দটি গঠিত হয়েছে 'টালিগঞ্জ' এবং 'হলিউড' শব্দের সংমিশ্রনে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হলেও ১৯৫০ এর দশকে বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের শুরু হয়। এ সময় সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ পরিচালকদের পরিচালনায় বাংলা চলচ্চিত্র এক অনবদ্য রূপ লাভ করে। এ সময়ের বাংলা চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা- অভিনেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, রবি ঘোষ, শর্মিলা ঠাকুর, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, সুপ্রিয়া দেবী, ছায়াদেবী, চিন্ময়, জহর প্রমুখ। এই পর্বের একজন বিখ্যাত অভিনেতা হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আদি বাড়ি ছিল অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কাছে কয়া গ্রামে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতামহের আমল থেকে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে থাকতে শুরু করেন।[২] সৌমিত্র পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন কৃষ্ণনগরের সেন্ট জন্স বিদ্যালয়ে। তারপর পিতৃদেবের চাকরি বদলের কারণে সৌমিত্রর বিদ্যালয়ও বদল হতে থাকে এবং উনি বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করেন হাওড়া জিলা স্কুল থেকে। তারপর কলকাতার সিটি কলেজ থেকে প্রথমে আইএসসি এবং পরে বিএ অনার্স (বাংলা) পাস করার পর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ অফ আর্টস-এ দু-বছর পড়াশোনা করেন। কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়ার সময় নাট্যব্যক্তিত্ব শিশির কুমার ভাদুড়ীর সাথে যোগাযোগ ঘটে তার। তখন থেকে অভিনয়কে জীবনের প্রধান লক্ষ্য করে নেবার কথা দেখেছিলেন। ভাদুড়ির অভিনয় সৌমিত্রকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।[৩]

অভিনেতা হিসেবে তিনি ছিলেন একজন কিংবদন্তি। আবৃত্তি শিল্পী হিসেবেও ছিল তাঁর যথেষ্ট সুনাম। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'হঠাৎ দেখা', জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' প্রভৃতি কবিতা গুলি শাশ্বত সৌন্দর্য লাভ করে। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় আকাশবাণীর ঘোষক হিসেবে। এরই সাথে চলছিল থিয়েটারে অভিনয় করা এবং ছবিতে অডিশন দেওয়ার কাজ। বিশ্বজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ৩৪ টি সিনেমার মধ্যে তিনি ১৪ টি সিনেমাতে কাজ করেছেন। সিনেমা ছাড়াও তিনি বহু নাটক, যাত্রা ও দূরদর্শন ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন। সুদীর্ঘ ৬০ বছরের চলচ্চিত্র জীবনে তিনি ৩০০ টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত সিনেমার মধ্যে রয়েছে[৪]-

বছর	চলচ্চিত্রের শিরোনাম	চরিত্রের নাম	পরিচালক	টীকা
১৯৫৯	অপুর সংসার	অপু	সত্যজিৎ রায়	
১৯৬০	ক্ষুধিত পাষাণ		তপন সিংহ	
১৯৬০	দেবী		সত্যজিৎ রায়	
১৯৬১	স্বরলিপি		অসিত সেন	
১৯৬১	তিন কন্যা		সত্যজিৎ রায়	
১৯৬১	স্বয়ম্বরা		অসিত সেন	
১৯৬১	পুনশ্চ		মৃণাল সেন	
১৯৬১	ঝিন্দের বন্দি	ময়ূরবাহন	তপন সিংহ	
১৯৬২	শাস্তি		দয়াভাই	
১৯৬২	অতল জলের আহ্বান		অজয় কর	
১৯৬২	আগুন		অসিত সেন	
১৯৬২	বেনারসী		অরূপ গুহঠাকুরতা	
১৯৬২	অভিযান	নরসিং	সত্যজিৎ রায়	
১৯৬৩	সাত পাকে বাঁধা	সুখেন্দু	অজয় কর	
১৯৬৩	শেষ প্রহর		প্রান্তিক	
১৯৬৩	বর্ণালী		অজয় কর	
১৯৬৪	প্রতিনিধি		মৃণাল সেন	
১৯৬৪	চারুলতা	অমল	সত্যজিৎ রায়	
১৯৬৪	কিনু গোয়ালার গলি		ও সি গাঙ্গুলী	
১৯৬৪	অয়নান্ত		সন্ধানী	
১৯৬৫	বাক্স বদল		নিত্যানন্দ দত্ত	
১৯৬৫	কাপুরুষ		সত্যজিৎ রায়	
১৯৬৫	একই অঙ্গে এত রূপ		হরিসাধন দাশগুপ্ত	
১৯৬৫	একটুকু বাসা		তরুণ মজুমদার	
১৯৬৫	আকাশ কুসুম	অজয়	মৃণাল সেন	
১৯৬৬	মনিহার		সলিল সেন	
১৯৬৬	কাচ কাটা হীরে		অজয় কর	
১৯৬৬	অঙ্গীকার		সুশীল ঘোষ	

১৯৬৬	জোড়া দিঘির চৌধুরী পরিবার		অজিত লাহিড়ী	
১৯৬৭	হঠাৎ দেখা		নিত্যানন্দ দত্ত	
১৯৬৭	হাটে বাজারে		তপন সিংহ	
১৯৬৭	প্রস্তর স্বাক্ষর		সলিল দত্ত	
১৯৬৭	অজানা শপথ		সলিল সেন	
১৯৬৭	মহাশ্বেতা		পিনাকি মুখোপাধ্যায়	
১৯৬৮	পরিশোধ		অর্ধেন্দু সেন	
১৯৬৮	বাঘিনী		বিজয় বসু	
১৯৬৯	তিন ভুবনের পারে		আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৯৬৯	পরিণীতা	শেখর	অজয় কর	
১৯৬৯	অপরিচিত		সলিল দত্ত	
১৯৬৯	চেনা অচেনা		হিরেন নাগ	
১৯৬৯	বালক গদাধর		হিরন্ময় সেন	
১৯৭০	অরণ্যের দিনরাত্রি	অসীম	সত্যজিৎ রায়	
১৯৭০	আলেয়ার আলো		মঙ্গল চক্রবর্তী	
১৯৭০	পদ্ম গোলাপ		অজিত লাহিড়ী	
১৯৭০	প্রথম কদম ফুল		ইন্দর সেন	
১৯৭১	মাল্যদান		অজয় কর	
১৯৭১	খুঁজে বেড়াই		সলিল দত্ত	
১৯৭১	সংসার		সলিল সেন	
১৯৭২	স্ত্রী		সলিল দত্ত	
১৯৭২	জীবন সৈকতে		স্বদেশ সরকার	
১৯৭২	অপর্ণা		সলিল সেন	
১৯৭৩	নতুন দিনের আলো		অজিত গাঙ্গুলী	
১৯৭৩	বসন্ত বিলাপ		দিনেন গুপ্ত	
১৯৭৩	নিশিকন্যা		আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৯৭৩	অশনি সংকেত		সত্যজিৎ রায়	

১৯৭৩	রক্ত (বিলেত ফেরত)		চিদানন্দ দাশগুপ্ত	
১৯৭৩	শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন		সলিল দত্ত	
১৯৭৩	অগ্নি ভ্রমর		অজিত গাঙ্গুলী	
১৯৭৩	এপার অপার		আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৯৭৪	সোনার কেল্লা	প্রদোষ চন্দ্র মিত্র / ফেলুদা	সত্যজিৎ রায়	
১৯৭৪	সঙ্গিনী		দীনেন গুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত (সঙ্গীত পরিচালক)
১৯৭৪	অসতী		সলিল দত্ত	
১৯৭৪	যদি জানতেম			
১৯৭৪	সংসার সীমান্তে			
১৯৭৬	দত্তা			
১৯৭৮	জয় বাবা ফেলুনাথ	প্রদোষ চন্দ্র মিত্র / ফেলুদা	সত্যজিৎ রায়	
১৯৭৯	নৌকাডুবি			
১৯৭৯	দেবদাস			
১৯৭৯	গণদেবতা		তরুণ মজুমদার	
১৯৮০	হীরক রাজার দেশে	উদয়ন পণ্ডিত	সত্যজিৎ রায়	
১৯৮১	খেলার পুতুল			
১৯৮৩	অমর গীতি		তরুণ মজুমদার	
১৯৮৪	কোনি	ক্ষিদ্দা	সরোজ দে	
১৯৮৪	ঘরে বাইরে	সন্দীপ	সত্যজিৎ রায়	
১৯৮৬	শ্যাম সাহেব			
১৯৮৭	একটি জীবন			
১৯৮৮	লা ন্যুই বেঙ্গলি (Nuit Bengali, La)			
১৯৮৯	গণশত্রু	ডা. অশোক গুপ্ত	সত্যজিৎ রায়	

১৯৯০	শাখাপ্রশাখা	প্রশান্ত	সত্যজিৎ রায়	
১৯৯২	তাহাদের কথা		বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	
১৯৯২	মহাপৃথিবী		মৃণাল সেন	
১৯৯৪	হুইল চেয়ার		তপন সিংহ	
১৯৯৪	উত্তরণ		সন্দীপ রায়	
১৯৯৪	সোপাণ			
১৯৯৬	বৃন্দাবন ফিল্ম স্টুডিয়োজ (Vrindavan Film Studios)			
১৯৯৯	অসুখ		ঋতুপর্ণ ঘোষ	
২০০০	পারমিতার একদিন		অপর্ণা সেন	
২০০১	দেখা			
২০০২	সাঁঝবাতির রূপকথারা			
২০০২	আবার অরণ্যে	অসীম	গৌতম ঘোষ	
২০০৩	পাতালঘর			
২০০৪	Schatten der Zeit (শ্যাডোস অফ টাইম)		ফ্লোরিয়ান গ্যালেনবারগার	
২০০৫	ফালতু			
২০০৫	নিশিযাপন		সন্দীপ রায়	
২০০৫	১৫ পার্ক অ্যাভিনিউ			
২০০৬	দ্য বঙ কানেকশন		অঞ্জন দত্ত	
২০০৭	চাঁদের বাড়ি		তরুণ মজুমদার	
২০০৮	১০:১০	দুর্গাপ্রসাদ	অরিন পাল	
২০০৯	অংশুমানের ছবি	প্রদ্যুৎ	অতনু ঘোষ	
২০০৯	দ্বন্দ্ব			
২০১১	দ্য ফরলর্ন/The Forlorn (স্বল্পদৈর্ঘ্য)			
২০১২	লাইফ ইন পার্কস্ট্রিট	নীলাদ্রি	রাজ মুখার্জি	
২০১২	পাঁচ অধ্যায়	ঋষিদা	প্রতিম ডি. গুপ্ত	
২০১২	হেমলক সোসাইটি	কর্ণেল	সৃজিত মুখোপাধ্যায়	

২০১৩	শূণ্য অঙ্ক	মরফি	গৌতম ঘোষ	অনুপম রায় (সঙ্গীত পরিচালক)
২০১৩	বাইসাইকেল কিক	মেন্টর	দেবাশিস সেনশর্মা ও সুমিত দাস	সঙ্গীত: জয় সরকার, অতুল প্রসাদ সেন, মৈনাক বাম্পি নাগচৌধুরী
২০১৩	রূপকথা নয়		অতনু ঘোষ	
২০১৪	যারা রোদ্দুরে ভিজেছিল	দ্বারকা ভাদুড়ি	ভার্গোনাথ ভট্টাচার্য	
২০১৫	বেলাশেষে	বিশ্বনাথ মজুমদার	নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
২০১৫	অহল্যা	গৌতম সাধু	সুজয় ঘোষ	
২০১৫	রুম নম্বর ১০৩	রুদ্র চ্যাটার্জী	অনীক চট্টোপাধ্যায়	
২০১৫	বিরাট ২২		প্রভাত রায়	
২০১৬	সঙ্গাবোরা		বুলান ভট্টাচার্য	
২০১৬	প্রাক্তন	ট্রেনের প্যাসেঞ্জার	নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
২০১৬	বাস্তব	অমিতাভ রক্ষিত		
২০১৬	রোম্যান্টিক নয়	সাইক্রিয়া-টিস্ট	রাজীব চৌধুরী	
২০১৬	নষ্ট পুরুষ	বাবা	নির্মাল্য চক্রবর্তী ও নাড়ুগোপাল মণ্ডল	
২০১৬	পিস হেভেন			
২০১৭	পোস্ত		নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
২০১৭	দ্য অ্যানিভার্সারি	রঞ্জন গাঙ্গুলি		
২০১৭	শেষ চিঠি	শিবনাথ	তন্ময় রায়	

২০১৭	সমান্তরাল	সুজনের বাবা	পার্থ চক্রবর্তী	
২০১৭	ময়ূরাক্ষী	সুশোভন	অতনু ঘোষ	
২০১৭	সিক্রেট লাভ স্টোরি	অনিকেত	নাড়ুগোপাল মণ্ডল	
২০১৮	বক্সার	চার্চের ফাদার	সঞ্জয় বর্ধন	
২০১৮	কুসুমিতার গপ্পো	রত্নাকর সেন	ঋষিকেশ মণ্ডল	
২০১৮	জাল	কাদের ভাই		
২০১৮	ফ্ল্যাট নম্বর ৬০৯		অনির্বাণ ভট্টাচার্য	
২০১৮	ভ্যালেন্টাইনস ডে	তারাশঙ্কর		
২০১৮	সোনার পাহাড়	রজত	পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়	
২০১৮	মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি	গোবিন্দ-নারায়ণ	অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়	
২০১৯	জন্মদিন	পরেশ সেনগুপ্ত	অর্ণব চ্যাটার্জী	
২০১৯	বসু পরিবার	প্রণবেন্দু বসু	সুমন ঘোষ	
২০১৯	শেষের গল্প	অমিত রায়	জিৎ চক্রবর্তী	
২০১৯	আড্ডা	ধৃতিমান পাঁজা	দেবায়ুশ চৌধুরী	
২০১৯	সাঁঝবাতি	ছানাদাদু	শৈবাল ব্যানার্জী ও লীনা গঙ্গোপাধ্যায়	
২০২০	বরুণবাবুর বন্ধু	বরুণবাবু	অনীক দত্ত	
২০২০	শ্রাবণের ধারা	অমিতাভ সরকার	অভিজিৎ গুহ ও সুদেষ্ণা রায়	
২০২১	অবলম্বন	দয়াল বসু	নাড়ুগোপাল মণ্ডল	
২০২১	অভিযান	স্ব-চরিত্র	পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়	
২০২২	৭২ ঘন্টা	স্ট্রেঞ্জার	অতনু ঘোষ	
২০২২	বেলাশুরু	বিশ্বনাথ মজুমদার	নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা হল অপুর সংসার (The World of Apu)। এই সিনেমাটির মুক্তি পায় ১লা মে, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। এই সিনেমাটির স্থিতিকাল ছিল ১ ঘন্টা ৪৭ মিনিট। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' উপন্যাস অবলম্বনে এই সিনেমাটি তৈরি করেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। এটি ছিল 'অপু ত্রয়ী' (Apu Trilogy)-র শেষ চলচ্চিত্র। অন্য দুটি চলচ্চিত্র হল- 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'অপরাজিত' (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এখানে মূল চরিত্র অপুর চরিত্রে অভিনয় করেন। অপুর স্ত্রী অপর্ণার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শর্মিলা ঠাকুর। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের পাশাপাশি বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে এই চলচ্চিত্রটি। এই সিনেমার কাহিনি ছিল অপুর অভাব- অনটনের জীবনকে ঘিরে। শিক্ষিত বেকার যুবক অপু কলকাতার ভাড়া বাড়িতে থেকে টিউশনি করে পেট চালায়। বাড়ি ভাড়া দিতে না পারায় বাড়ি মালিকের সঙ্গে তার ঝগড়াও চলে। বাড়িওয়ালা তাকে তুলে দেওয়ার হুমকিও দেয়। কিন্তু এগুলো কিছুই গ্রাহ্য করে না সে। একাকী জীবনে উপন্যাস লেখে অপু ,বাঁশি বাজায় সে। বহু বছর পর কলেজের প্রাণের বন্ধু পুলুর সাথে দেখা হলে দুজনে ঘোরাঘুরি করে। এরপর পুলু অপুকে তার মাসির মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। ঘটনাচক্রে পুলুর মাসির মেয়ে অপর্ণাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় অপু। নব বিবাহিত স্বামী- স্ত্রী দুজনে চলে আসে শহরে। অভাবের সংসারে দিন কাটে তাদের। ধীরে ধীরে বাড়ে তাদের ভালোবাসা। সেই সুন্দর ভালোবাসার প্রীতির স্মৃতি বাঙালি আজও মনে রেখেছে। সিনেমার বেশ কিছু দৃশ্য বাড়িয়ে তোলে ভালোবাসা। যেমন- অপুর সিগারেটের খাপে অপর্ণা লিখে রাখে সিগারেট খাওয়া কমানোর আবদার। আবার, অপু বাড়িতে কাজ করার লোক আনার জন্য আরেকটি নতুন টিউশনি করাতে চাইলে অপর্না বলে আমার গরিব বর আরেকটি টিউশনি ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসবে। এতেই অপর্ণার ঢের ভালো। এইভাবে ভালোবাসার সংসারে সন্তান সম্ভবা হয় অপর্ণা। কিন্তু তাদের সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় অপর্ণা। তাই সন্তান কাজলকে মেনে নিতে পারে না অপু। কারণ অপু মনে করে কাজল আছে বলেই অপর্ণা আজ নেই। পরে যদিও কাজলকে সঙ্গে নেয় অপু। দুজনের কলকাতা যাত্রার মধ্য দিয়েই শেষ হয় কালজয়ী এই সিনেমার।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত এবং সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'তিন কন্যা' মুক্তি পায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। এই চলচ্চিত্রটির স্থিতিকাল ছিল ১ ঘন্টা ৫২ মিনিট। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প 'পোস্টমাস্টার', 'মনিহারা' এবং 'সমাপ্তি'কে নিয়ে এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিন কন্যার প্রথম ছবি পোস্টমাস্টার। এই ছবির প্রধান দুটি চরিত্র হলো- কিশোরী রতন এবং পোস্টমাস্টার নন্দলাল। এই ছবিতে রতন চরিত্রে অভিনয় করেন চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় আর নন্দলাল চরিত্রে অভিনয় করেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার ছেলে নন্দলালের পোস্টমাস্টার হিসাবে উলাপুরে থাকা এবং তার কাছে থাকা বালিকা রতনকে নিয়েই এই ছবি। রতনকে নন্দলাল বোনের মত আপন করে নেয়। রতনকে সে লেখাপড়া শেখায়, অবসর সময়ে নিজের বাড়ির গল্প বলে শোনায়। এইভাবে রতন নন্দলালের বাড়ির লোকজনকে নিজের লোক বলে ভাবতে শুরু করে। আবার

নন্দলাল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে তাকে সেবা করে সুস্থ করে তোলে রতন। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় জ্বরের ঘোরে রতনকে নন্দলাল চিনতে না পারায় রতন অনুভব করে এই বন্ধন ভঙ্গুর। শেষে রতনকে ফেলে রেখে কলকাতায় চলে যায় নন্দলাল। তিন কন্যার দ্বিতীয় ছবি 'মনিহারা'। এই ছবিতে মণিমালিকার চরিত্রে অভিনয় করেন কণিকা মজুমদার আর জমিদার ফণীভূষণ সাহার ভূমিকায় অভিনয় করেন কালি বন্দ্যোপাধ্যায়। জমিদার ফণীভূষণ সাহার নিঃসন্তান স্ত্রী মণিমালিকা ছিলেন গহনার প্রতি অতি আসক্ত। তার এই আসক্তিই ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ করে তোলে। এমনকি স্বামীর সংকটে মণিমালিকা স্বামীকে ফেলে রেখে তার গয়নাগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর মণিমালিকাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এবং ফণীভূষণ তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। তিন কন্যার শেষ ছবি 'সমাপ্তি'। এখানে মৃন্ময়ী চরিত্রে অভিনয় করেন অপর্ণা সেন আর তার স্বামী অমূল্যের চরিত্রে অভিনয় করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই সিনেমায় সত্যজিৎ রায় মৃণ্ময়ী কে চঞ্চলা রূপে উপস্থাপন করে গ্রাম বাংলার গৃহবধূর সাধারণ ধীরমতি রূপটিকে ভেঙে দিয়েছেন। সিনেমায় দেখানো বেশ কিছু মুহূর্ত হাস্যকৌতুকের সৃষ্টি করে। যেমন- মৃন্ময়ীর গয়না গায়েই বাসর ঘর থেকে গাছ বেয়ে পালিয়ে যাওয়া, পোষা কাঠবিড়ালির সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি।[৫]

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর মুক্তি পায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত আরেকটি চলচ্চিত্র 'পুনশ্চ'। রচয়িতা আশীষ বর্মনের গল্পের উপর ভিত্তি করে এই সিনেমাটি তৈরি করেন পরিচালক মৃনাল সেন। এই ছায়াছবিটির স্থিতিকাল ছিল ২ ঘন্টা। এই ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন কণিকা মজুমদার, পাহাড়ি সান্যাল, কালী ব্যানার্জি, শেফালী ব্যানার্জি প্রমুখ। মৃনাল সেনের এই সিনেমার গল্পে উঠে এসেছে সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে লড়াই করে টিকে থাকা এক নারীর গল্প। সিনেমাটি এমন দম্পতিদের ঘিরে আবর্তিত হয়েছে যারা সামাজিক প্রত্যাশার সাথে লড়াই করেছে। সিনেমাটি চিত্রিত করে লোকেরা কিভাবে তাদের নিজেদের ইচ্ছার সাথে লড়াই করে এবং সমাজ তাদের কাছে কী প্রত্যাশা করে। ছবিটি সেরা বাংলা ছবি বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ছায়াছবি 'সাত পাকে বাঁধা'। এই সিনেমার পরিচালক ছিলেন অজয় কর। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে নির্মিত হয় এই সিনেমাটি। এই সিনেমার স্থিতিকাল ছিল ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। এই সিনেমায় সুখেন্দু দত্ত চরিত্রে অভিনয় করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত অনাথ। সুখেন্দুর স্ত্রী অর্চনা বসুর চরিত্রে অভিনয় করেন সুচিত্রা সেন। তিনি ছিলেন একজন সুশিক্ষিতা মহিলা ও ধনী পরিবারের কন্যা। অর্চনার বাবা এবং মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন পাহাড়ি সান্যাল এবং ছায়া দেবী। সিনেমার কাহিনীতে দেখা যায় টিউশনি করে পেট চালায় অনাথ বেকার যুবক সুখেন্দু। অর্চনার সাথে তার পরিচয় ভালোবাসা পেরিয়ে পরিণয়ে পৌঁছায়। কিন্তু অনাথ গরিব ছেলের সাথে অর্চনার সম্পর্ক শুরু থেকেই মেনে নিতে পারেনা অর্চনার মা। এবং তার মায়ের কারণেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তাদের। এই সিনেমার অনুকরণে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তেলেগুতে নির্মিত হয় 'বিবাহ বন্ধম', ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দিতে 'কোরা কাগজ' এবং ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তামিলে 'ললিথা'।

এই সিনেমাতে অভিনয় করে সুচিত্রা সেন 'Silver Prize for Best Actress' পান। তিনিই প্রথম কোন ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'চারুলতা' মুক্তি লাভ করে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এখানে অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটের এই চলচ্চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' গল্প অবলম্বনে রচিত। চারুলতার চরিত্রে এখানে অভিনয় করেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, ভূপতির ভূমিকায় শৈলেন মুখোপাধ্যায়, উমাপদের ভূমিকায় শ্যামল ঘোষ প্রমুখ। এছাড়া মন্ডা, ব্রজা, নিশিকান্ত, শশাঙ্ক, নীলোৎপল, জগন্নাথের চরিত্রে অভিনয় করেন যথাক্রমে গীতালি রায়, ভোলানাথ কোয়াল, সুকু মুখার্জি, দিলীপ বোস, জয়দেব, বঙ্কিম ঘোষ প্রমুখ। ইংরেজিভাষী বিশ্বে এই চলচ্চিত্র টি 'The Lonely Wife' নামে পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীর এক উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারকে কেন্দ্র করে এই কাহিনীটি রচিত হয়েছে। পরিবারের কর্তা ভূপতি পত্রিকার কাজে মগ্ন থাকায় যৌবনে পদার্পণকারী স্ত্রী চারুলতার দিকে নজর দেওয়ার সময় পান না। তাই চারুলতার নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য বাড়িতে আগমন ঘটে চারুর ভাই উমাপদ, উমাপদের স্ত্রী মন্দাকিনী, ভূপতির পিসতুতো ভাই অমলের। অমলের সাথে চারুর ভালো সম্পর্ক থাকায় ভূপতি অমলকে চারুর লুক্কায়িত সাহিত্যিক প্রতিভা বের করে আনার দায়িত্ব দেয়। তারই সঙ্গে দেয় পত্রিকার শুদ্ধতার কাজ। এবং চারুর ভাই উমাপদকে দেয় পত্রিকার আর্থিক দিকের সমস্ত দায়িত্বভার। ধীরে ধীরে অমলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে চারুলতা। টাকা নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে উমাপদ। বন্ধ হয়ে যায় ভূপতির পত্রিকা। অমলও চলে যায় বাড়ি ছেড়ে। অমলের বিবাহের উদ্যোগের কথা জানতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে চারু, যা দেখে ফেলে ভূপতি। ভাইয়ের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক ভূপতি কে অশান্তিতে ফেলে এবং তাদের মিল হওয়াটাও চলে যায় অসম্ভবের পর্যায়ে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই চলচ্চিত্রটি বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সিলভার বেয়ার পুরস্কার এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের গোল্ডেন লোটাস পুরস্কার, সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়।[৬]

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'অরণ্যের দিনরাত্রি' মুক্তি লাভ করে ১৬ই জানুয়ারি, ১৯৭০ সালে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাস অবলম্বনে ১ ঘন্টা ৫৫ মিনিটের এই সিনেমাটি নির্মাণ করেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। এই সিনেমায় অসীম চরিত্রে অভিনয় করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সৌমিত্রের সহ অভিনেতা- অভিনেত্রীরা ছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (সঞ্জয় চরিত্রে), সমিত ভঞ্জ (হরি চরিত্রে), রবি ঘোষ (শেখর চরিত্রে), পাহাড়ী সান্যাল (সদাশিব ত্রিপাঠী চরিত্রে) শর্মিলা ঠাকুর (অপর্ণা চরিত্রে) কাবেরী বসু (জয়া চরিত্রে) সিমি গারেওয়াল (দুলি চরিত্রে) অপর্ণা সেন প্রমুখ। এই সিনেমাটি ২০ তম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা চলচ্চিত্রের জন্য গোল্ডেন বিয়ারের জন্য মনোনীত হয়েছিল।

অশনি সংকেত মুক্তি পাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' উপন্যাস অবলম্বনে এই সিনেমাটি তৈরি করেন সত্যজিৎ রায়। 'অশনি সংকেত' ছিল পরিচালক সত্যজিৎ রায় পরিচালিত প্রথম রঙিন ছায়াছবি। এটি ছিল

১ ঘন্টা ৪১ মিনিটের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটি বাংলা চলচ্চিত্র। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এখানে গঙ্গাচরণ চক্রবর্তীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনিই ছিলেন এই ছায়াছবিতে মুখ্য ভূমিকায়। অন্যান্য অভিনেতা- অভিনেত্রীরা হলেন বাংলাদেশী অভিনেত্রী ববিতা (অনঙ্গ বউ চরিত্রে), সন্ধ্যা রায় (ছুটকি চরিত্রে), চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (মতি চরিত্রে), রমেশ মুখোপাধ্যায় (বিশ্বাস চরিত্রে), গোবিন্দ চক্রবর্তী (দীনবন্ধু চরিত্রে), ননী গাঙ্গুলী (যদু চরিত্রে) প্রমুখ। এই ছায়াছবির মূল বিষয়বস্তু ছিল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ মন্বন্তর এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামবাংলায় আর্থসামাজিক পটপরিবর্তন। গঙ্গাচরণ নামে এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীকে নিয়ে এক গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। গ্রামবাসীদের সরলতার সুযোগে গঙ্গাচরণ সেখানে চতুরতা করলেও দুর্ভিক্ষ এসে পরায় শেষ রক্ষা হয় না। গঙ্গাচরণের স্ত্রী অনঙ্গ কায়িক শ্রমের মাধ্যমে উপার্জনের জন্য গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে কাজে যায়। যদু নামে গ্রামের এক যুবক গ্রামের বউ ছুটকিকে নিয়ে যেতে চাইলে ছুটকি তাকে প্রত্যাখ্যান করে। যদিও ছুটকি পরে পেটের জ্বালায় সেই লোকটির সঙ্গে পালিয়ে যায়। গ্রামের এক নিচু জাতের মহিলা মারা গেলে গঙ্গাচরণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ত্যাগ করে সেই মহিলার সৎকার করেন। ছায়াছবির শেষে অন্তসত্ত্বা অনঙ্গকে নিয়ে গঙ্গাচরণ ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা গ্রাম ত্যাগ করে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এই সিনেমাটির সংগীত পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক পুরস্কার পায়। এছাড়া শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক চলচ্চিত্র, বার্লিনের গোল্ডেন বিয়ার, শিকাগোর গোল্ডেন হিউগো প্রভৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল এই সিনেমাটি ।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, একটি শ্রেষ্ঠ কাজ সোনার কেল্লা মুক্তি পায় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ২৭ ডিসেম্বর। সোনার কেল্লা বাংলা চলচ্চিত্রকে এনে দিয়েছিল একটি নতুন ধারার সন্ধান। এটি ছিল একটি গোয়েন্দা চলচ্চিত্র। সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা' উপন্যাস অবলম্বনে এই চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়। 'সোনার কেল্লা'র রচয়িতা, পরিচালক, সুরকার, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার ছিলেন একই ব্যক্তি এবং তিনি হলেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়ের অনবদ্য সৃষ্টি ফেলুদা চরিত্রে এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য অভিনেতা- অভিনেত্রীরা হলেন সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় (তোপসে চরিত্রে), সন্তোষ দত্ত (জটায়ু চরিত্রে), কুশল চক্রবর্তী (মুকুল ধর চরিত্রে), শৈলেন মুখার্জি (ড. হেমাঙ্গ হাজরা চরিত্রে), কামু মুখার্জি (মন্দার বোস চরিত্রে), অজয় ব্যানার্জি (অমিয়নাথ বর্মন চরিত্রে), হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সিধু জ্যাঠা চরিত্রে) প্রমুখ। এই চলচ্চিত্রে ফেলুদা হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ছিল অনবদ্য ,যুগান্তকারী। সিনেমার কাহিনি উল্লেখে বলা যায়, মুকুল নামে একটি ছেলে যে তার পূর্ব জন্মের কথা বলতে পারতো। তাকে নিয়ে ড. হাজরা ঘুরতে যান রাজস্থানে। কারণ ছিল তাকে সুস্থ করে তোলা। মুকুলকে অপহরণের ষড়যন্ত্র শুরু হলে মুকুলের বাবা ফেলুদাকে একজন ব্যক্তিগত গোয়েন্দা হিসেবে তার ছেলেকে বাঁচানোর কথা বলেন। ফেলুদা কাজটি হাতে নিয়ে তোপসেকে সঙ্গে নিয়ে রাজস্থানের পথে যান এবং ট্রেনে তাদের সঙ্গে দেখা হয় বিখ্যাত লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি বা জটায়ুর। বর্মন ও বোস- এই দুইজন ড. হাজরা কে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেন যদিও ডক্টর হাজরা বেঁচে যান এবং মুকুলকে অপহরণ করে তারা। এদের একজন ফেলুদাকে বিষাক্ত বিছা দিয়ে মারতে

চেষ্টা করেন। রত্নচুরির জন্য তারা মুকুলের পূর্ব জন্মের কথা জানার শক্তিকে ব্যবহার করে এবং জয়সলমীর কেল্লায় যান। ফেলুদারাও সেখানে যান। এবং তারা সকলে ফেলুদার কাছে ধরা পড়ে। এই সিনেমার পুরস্কারের ঝুলিতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেরা ছবি, সেরা পরিচালক- সত্যজিৎ রায়, ভারত সরকারের রাষ্টপতির রৌপ্য পদক (১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ), Best Colour Photography (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ), Best Director- সত্যজিৎ রায় (১৯৭৫খ্রিষ্টাব্দ), Best Screenplay- সত্যজিৎ রায় (১৯৭৫খ্রিষ্টাব্দ) প্রভৃতি।
সৌমিত্রের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি 'জয়বাবা ফেলুনাথ' মুক্তি পায় ৫ জানুয়ারি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। এই ছবির রচয়িতা, চিত্রনাট্যকার, কাহিনিকার, সুরকার, পরিচালক ছিলেন সত্যজিৎ রায়। এই ছবির স্থিতি কাল এক ঘন্টা ৫২ মিনিট। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এখানে ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। মগনলাল মেঘরাজ চরিত্রে উৎপল দত্ত, জটায়ু চরিত্রে সন্তোষ দত্ত, তোপসে চরিত্রে সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, মছলিবাবা চরিত্রে মনু মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, রুক্মিণী কুমার, বিপ্লব চ্যাটার্জির মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। এই সিনেমা যেমন চমকের সাথে শুরু হয় তেমনি শেষও হয় চমকের সাথে। এই কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মূলত বেনারস শহরকে কেন্দ্র করে। ফুটে উঠেছে সেখানকার বনেদি ঘোষাল বাড়ির বহুমূল্যবান গণেশ মূর্তিকে পাওয়ার জন্য মগনলালের কুপ্রচেষ্টা। ঘোষাল বাড়ির সদস্যরাও সেই মূর্তিকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে থাকে। শেষে ফেলুদা স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় চক্রান্তের শেষ ধরেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের সেরা শিশু সিনেমা চলচ্চিত্রের জন্য এই সিনেমাটি জাতীয় পুরস্কার পায়।

শরৎচন্দ্রের রচিত উপন্যাস 'দেবদাস' অবলম্বনে নির্মিত সিনেমা 'দেবদাস' মুক্তি পায় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এখানে মুখ্য চরিত্র দেবদাসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিটের এই চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন পরিচালক দিলীপ রায়। এই সিনেমায় সৌমিত্রের সহ অভিনেতা অভিনেত্রীরা ছিলেন সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায় (পার্বতী চরিত্রে), সুপ্রিয়া চৌধুরী (চন্দ্রমুখী চরিত্রে), উত্তম কুমার (চুনিলাল চরিত্রে), চেতনা দাস (কুমুদ; দেবদাসের বৌদি চরিত্রে), সন্ধ্যা রানী (দেবদাসের মা চরিত্রে), ভানু বন্দোপাধ্যায়, অনুপ কুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এই সিনেমা প্রসঙ্গে বলেছেন- "দেবদাস সাহিত্য হিসেবে অপছন্দ করেছি ছেলেবেলা থেকে, কারণ একটি ছেলে একটি মেয়েকে পেল না বলে নিজেকে ধ্বংস করছে এটা নেতিবাচক মনে হতো। কিন্তু যখন দেবদাস- এ অভিনয় করার ডাক এল, তখন প্রথম যে কথা মনে হলো, তা হচ্ছে, এত বছর ধরে বিশাল বাঙালি সমাজ কেন তাকে মনে রেখেছে। আমার নিজের সাধারণভাবে বৃহত্তর জন সমাজের উপর কোথায় একটা গভীর আস্থা আছে। সেই আস্থা থেকে বুঝতে চেষ্টা করলাম এবং খুঁজে পেলাম। যে সময় এটি লেখা, যে বয়সের চরিত্রদের নিয়ে এ কাহিনি, তা ঐতিহাসিক ভাবে দেখলে সত্য বলেই মনে হবে। পিতৃশাসিত ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ১৮ বছরের এক যুবক তার নির্বাচিত নারীকে না পেয়ে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ বা অন্য কিছু করতে পারে না, কেবল নিজেকে ধ্বংস করা ছাড়া। এই সত্য মর্মান্তিক। এটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় করাটাও সহজ হয়ে গিয়েছিল।"[৭] এই সিনেমার সংক্ষিপ্ত কাহিনি অনেকটা এরকম-

তালসোনাপুর গ্রামে দেবদাস ও পার্বতীর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব নিয়েই শুরু হয় এই সিনেমা। ঝগড়া, মারামারি, হাসি, কান্না, খেলাধূলা নিয়েই কাটে তাদের ছেলেবেলা। পার্বতীর থেকে বয়সে বড় হওয়ায় পার্বতী দেবদাসকে দেবদা বলে ডাকে, দেবদাস পার্বতীকে ডাকে পারু বলে। দেবদাস পার্বতীকে মারলেও পার্বতী তা পরিবারের বড়দের কাছে প্রকাশ করে না। এমনই ছিল তাদের বন্ধুত্ব। ঘটনা পরম্পরায় দেবদাসকে কলকাতায় পাঠানো হয় পড়াশোনার জন্য। কয়েক বছর পর দেবদাস ছুটিতে গ্রামে এলে দেখে তার ছেলেবেলার পারু অনেক বদলে গেছে। তারা দুজনেই অনুভব করে তাদের বাল্যকালের বন্ধুত্ব প্রেমে পৌঁছেছে। কিন্তু এই সম্পর্ক বিবাহ অবধি পৌঁছায় না। হাতিপোতা গ্রামে ভুবন চৌধুরী নামে এক জমিদারের সঙ্গে বিয়ে হয় পার্বতীর। দেবদাসও কলকাতায় চলে যায় এবং সেখানে চুনিলালের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব এবং চন্দ্রমুখী নামে এক বাইজীর সাথে তার পরিচিতি হয়। দেবদাসের প্রেমে পড়ে চন্দ্রমুখী। প্রথমদিকে দেবদাস চন্দ্রমুখী কে ঘৃণা করলেও পরবর্তীতে চন্দ্রমুখীর প্রেমে পড়তে বাধ্য হয়। নেশা, মদে আচ্ছন্ন অনিয়মিত জীবন চলতে থাকায় মৃত্যু আসন্ন হয়ে পড়ে দেবদাসের এবং দেবদাস তা বুঝতে পেরে পার্বতীকে দেওয়া তার পূর্বকথা রাখতে হাতিপোতা গ্রামের দিকে রওনা দেয়। এবং শেষে পার্বতীর বাড়ির সামনেই তার মৃত্যু হয়। পার্বতী এবং দেবদাস কেউই একে অপরের মুখও দেখার সুযোগ পায়না। দেবদা, দেবদা.... পার্বতীর এই আর্তনাদে সিনেমার শেষে সেই বার্তাই থাকে যা শরৎচন্দ্র তার উপন্যাসের শেষে উল্লেখ করেছিলেন এবং তা হল- "যদি এখন ও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মতো এমন করিয়া কাহার ও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহ-করস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে- যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।"[৮] এ সিনেমা অবলম্বনে পরবর্তীতে বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, উর্দু, মালায়ালাম প্রভৃতি ভাষায় অসংখ্য সিনেমা তৈরি হয়েছে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবনের একটি যুগান্তকারী সিনেমা হল 'হীরক রাজার দেশে'। এই সিনেমাটি মুক্তি পায় ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। ১ ঘন্টা ৫৮ মিনিটের এই সিনেমাটির রচয়িতা, কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, সুরকার, পরিচালক ছিলেন সত্যজিৎ রায়। এই সিনেমায় উদয়ন পন্ডিত চরিত্রে অভিনয় করে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। পাঠশালায় ছাত্রদের 'হিতোপদেশ' পড়ানোর মধ্য দিয়ে সৌমিত্রের অভিনয় শুরু হয় এই চলচ্চিত্রে। কালজয়ী এই সিনেমার অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা হলেন- তপেন চট্টোপাধ্যায় (গুপী চরিত্রে), রবি ঘোষ (বাঘা), উৎপল দত্ত (হীরক রাজা), কামু মুখোপাধ্যায় (প্রহরী), প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় (উদয়নের পিতা), আল্পনা গুপ্ত (উদয়নের মাতা), রবীন মজুমদার (চরণদাস), সুনীল সরকার (ফজল মিয়া), ননী গঙ্গোপাধ্যায় (বলরাম), অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদূষক), কার্তিক চট্টোপাধ্যায় (সভাকবি), হরিধন মুখোপাধ্যায় (সভার জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ) প্রমুখ। সমৃদ্ধ হীরক রাজ্যের স্বৈরাচারী রাজার স্বৈরাচার ফুটিয়ে তুলে ধরে এই চলচ্চিত্র। হীরার খনিতে কাজ করেও, সোনার ফসল ফলিয়েও হীরক রাজ্যের প্রজাদের দিন

কাটে অনাহারে। বিদ্রোহী স্বরকে দমিয়ে রাখে হীরক রাজা। শিক্ষাকে ভয় পায় হীরক রাজ। কারণ তার মতে, "এরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে।" সভাসদদের দিয়ে হীরক রাজ প্রচার করে- লেখাপড়া করে যেই, অনাহারে মরে সেই/ জানার কোন শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই/ বিদ্যালাভে লোকসান, নাই অর্থ নাই মান/ হীরক রাজা বুদ্ধিমান, করো সবে তার জয়গান।। গবেষকের জন্তর মন্তরের ঘরে ঢুকিয়ে মগজ ধোলাই করে প্রজাদের। তাদের মাথায় গেঁথে দেয় সভাকবির তৈরি করা হীরক রাজনুগত্যের কবিতা- বাকি রাখা খাজনা, মোটে ভালো কাজ না/ ভর পেট নাও খায়, রাজ কর দেওয়া যায় চায়/ যদি যায় যাক প্রাণ হীরকের রাজা ভগবান। খনির শ্রমিক তার অতিরিক্ত কায়িক শ্রম এবং এবং অনাহারে কষ্টের কথা জানাতে এলে সভাকবি শোনায়- যে করে খনিতে শ্রম, জেন তারে ডরে যম/ অনাহারে নাহি খেদ, বেশি খেলে বারে মেদ/ ধন্য শ্রমিকের দান, হীরকের রাজা ভগবান। এই সিনেমার বেশিরভাগ সংলাপই ছন্দে তৈরি। সমগ্র রাজ্য জুড়ে চলতে থাকে অন্যায় অত্যাচার অবিচার। উদয়ন পন্ডিত শিক্ষার সাথে যুক্ত থাকায় তার বাড়ি ভাঙচুর করে বই-পত্র, পুঁথি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর উদয়ন পালিয়ে যান। হীরক রাজ্যের সমগ্র অত্যাচার এবং তার প্রতিবাদ ফুটে ওঠে অমর পালের কণ্ঠে এবং চরণ দাসের অভিনয়ে গাওয়া গানে। এই গানের কিছু লাইন ছিল এমন-

'কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়
ও ভাইরে ও ভাই কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়।
আমি যেই দিকেতে চাই
দেখে অবাক বনে যাই
আমি অর্থ কোনো খুজি নাহি পাইরে।
দেখ ভালো জনে রইল ভাঙা ঘরে,
মন্দ যে সে সিংহাসনে চড়ে।
ও ভাই সোনার ফসল ফলায় যে তার
দুই বেলা জোটেনা আহার,
হীরার খনির মজুর হয়ে কানাকড়ি নাই।'

গুপী গাইন বাঘাবাইন সিরিজের এই সিনেমায় শেষে উদয়ন পন্ডিত গুপী, বাঘার সাথে মিলিত হয়ে হীরক রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এক স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘটায়। উদয়ন পন্ডিত প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে ওঠে- অনাচার কর যদি, রাজা তবে ছাড়ো গদি/ যারা তার ধামাধারি, তাদেরও বিপদ ভারি/গরিবে শোষণ পাপ, ক্ষমা চেয়ে নাহি মাফ/ নাই কোন পরিত্রান, হীরকের রাজা শয়তান। এই বলে সভাসদসহ হীরক রাজাকেই শেষে ভরা হয় তারই তৈরি যন্তর মন্তরের ঘরে। শেষ দৃশ্যে হীরক রাজার মূর্তি ভাঙ্গা হয় এবং সভাসদসহ হীরক রাজাও বলে- দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান। ১৯৮০ সালে এই সিনেমাটি শ্রেষ্ঠ বাংলা ভাষার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে ভারত সরকারের জাতীয় পুরস্কার পায়। এছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে এই চলচ্চিত্রটি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয়কে কখনো পেশা হিসেবে নেননি, তিনি নিয়েছিলেন নেশা হিসেবে, ভালোবাসা হিসেবে। নিজের কাজকে ভালোবেসেছিলেন বলেই তিনি এত সফল হতে পেরেছিলেন; হয়ে উঠেছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তি। তিনি ছিলেন স্বর্ণ যুগের প্রকৃত সোনা। বাংলা চলচ্চিত্রকে তিনি এনে দিয়েছিলেন একটি নবযুগের সন্ধান। তিনি সত্যজিৎ রায়ের ৩৪ টি সিনেমার মধ্যে ১৪ টি সিনেমাতেই অভিনয় করেছেন। সত্যজিৎ পর্বের চলচ্চিত্রগুলি তাঁকে আরও খ্যাতি এনে দিয়েছে। তাঁর ফেলুদা চরিত্র আজও বাঙালির কাছে আপন, প্রিয়। অসংখ্য সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রে সুন্দর অভিনয় করেও তিনি বলেছেন- "সাহিত্যগুণসম্পন্ন রচনানির্ভর চলচ্চিত্রে অভিনয় বিশেষ কোন সুবিধা পায়না। বরং খুব বেশি সাহিত্যগুণসম্পন্ন হলে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে বলে আমার মনে হয়।"[৯] প্রতিটি সিনেমার প্রতিটি চরিত্রের সাথে তাল মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠতেন যেমন সময়োপযোগী, তেমনি বাস্তব। শতাধিক ছবিতে কাজ করায় তার পুরস্কারের তালিকাও হয়েছে দীর্ঘ। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্গবিভূষণ' (২০১৭), ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' (২০০৪), 'দাদাসাহেব ফালকে'র (২০১২) পাশাপাশি বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেয়েছেন। ২০১৭ সালে তিনি ফ্রান্সের 'লিজিয়ন অফ অনার' পান। অভিনেতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন ভালো মনের মানুষ ,জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁর সাহিত্যকর্মও উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর লেখা বেশকিছু গ্রন্থ রয়েছে, যেমন- 'পরিচয়', 'অগ্রপথিকেরা', 'চরিত্রের সন্ধানে', 'শব্দরা আমার বাগানে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ২০২০ সালের ১৫ই নভেম্বর কোভিড- ১৯ আক্রান্ত হয়ে এই কালজয়ী মহামানবের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। বেলা ১২:১৫ মিনিটে তিনি কলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে শেষ বিদায় জানানো হয়।

সূত্রনির্দেশ

(১) মুখোপাধ্যায়, কালীশ- বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস ১৮৯৭ থেকে ১৯৪৭, পত্রভারতী, নবরূপে পত্রভারতী সংস্করণ, এপ্রিল ২০১২, পৃ: ১৫১

(২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ নভেম্বর, ২০২০

(৩)https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC?wprov=sfla1

(৪)https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4_%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE?wprov=sfla1

(৫)https://archive.roar.media/bangla/main/book-movie/teen-kanya-film-by-satyajit-ray

(৬)https://bn.wikipediaorgiki/%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0% A6%BE?wprov=sfla1

(৭) গুহ, মুকুল- বাংলা প্রকাশনার সেকাল ও একাল, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ: ৩১৬, ৩১৭

(৮) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র- শরৎ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, শুভম, চতুর্থ সংস্করণ আগস্ট ২০২০, পৃ: ২৮০- ২৮১

(৯) গুহ, মুকুল- তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৬

 ISSN-2319-8591

পুস্তক পর্যালোচনা

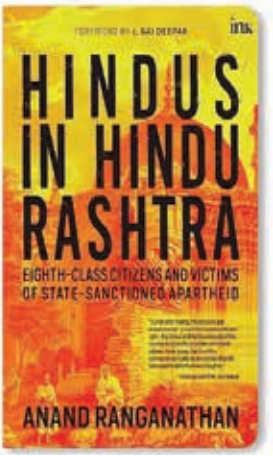

পুস্তক - **Hindus in Hindu Rashtra- Eighth-Class Citizens and Victims of State-Sanctioned Apartheid**
লেখক - আনন্দ রঙ্গনাথন
প্রকাশনা- BluOne Ink
ISBN: 9789392209475
প্রকাশকাল - ২০২৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৫২ (হার্ড ব্যাক)
বিক্রয় মূল্য- ৩৯৯/ (ভারতীয় টাকায়)

বর্তমান লেখক সমাজে আনন্দ রঙ্গনাথন একজন জনপ্রিয় লেখক। আনন্দ রঙ্গনাথনকে যদি এক কথায় বর্ণনা করা হয়, তাহলে তিনি হলেন পূর্ণাঙ্গ 'যৌক্তিক'। যুক্তির শিল্পবোধের দ্বারা কিভাবে সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায় তা তিনি তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে বর্তমান পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর নিখাত যুক্তির মায়াজালে অতীতের অনেক ব্যাখ্যান এবং ধারণা নিমেষে কুপোকাত হয়েছে। সেই কারণেই দেশের প্রতিষ্ঠিত বাম-উদারপন্থী ইতিহাসবেত্তা ব্রিগেড তার কঠোর সমালোচনা করেন। আনন্দ রঙ্গনাথন তাঁর সংকলন গ্রন্থ Hindus in Hindu Rashtra- Eighth-Class Citizens and Victims of State-Sanctioned Apartheid অর্থাৎ 'হিন্দু রাষ্ট্রে হিন্দু'-তে বাম-উদারপন্থী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন, যারা সর্বদা সংগঠিত ভাবে প্রচার করেন যে কীভাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ ভারতের মৌলিক কাঠামোর ধারণাকে হরণ করেছে, কিন্তু লেখক রঙ্গনাথন "হিন্দু জাতীয়তাবাদী" ত্রুটিগুলি তুলে ধরতেও ইতিহাসের বাস্তবতাকে পাঠক সমাজের সামনে উন্মোচিত করতে দ্বিধা করেন না। ঠিক এখানেই আনন্দ রঙ্গনাথনের লেখার ধরণে যুক্তির শক্তি এবং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের ব্যাখ্যা দেখা যায়; যা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই বইটি তাদের জন্য একটি

জ্ঞানগর্ভ পাঠ, যারা মনে করেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে একজন নাগরিক হওয়ার জন্য অপরাধবোধ অনুভব করেন। দেশের একটি শ্রেণির মানুষের মধ্যে সাধারণ বিশ্বাস রয়েছে যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা ক্রমশ আরও মেরুকৃত এবং অন্যায্য হয়ে উঠছে, এবং কোন "কঠোর" রাজনৈতিক দল এটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই বইটি কার্যকরভাবে সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে এটি বাস্তব সত্যতা থেকে অনেক দূরে। এই বইয়ে **আটটি স্পষ্ট এবং মার্জিত অধ্যায় রয়েছে এবং** বইটি প্রমাণ করে যে আমরা একটি ডিস্টোপিয়ান 'হিন্দু' রাষ্ট্রে বা কল্পনাপ্রসূত সর্বগ্রাসী ভয়ানক এক সমাজে বাস করছি না, বরং লেখক তাঁর শানিত যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন যে এই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত সমাজে বসবাস করছি।

এই বইয়ের অধ্যায়গুলিতে লেখক যখন হিন্দুদের 'আট শ্রেণীর নাগরিক এবং রাষ্ট্র-অনুমোদিত বর্ণবাদের শিকার' বলে অভিহিত করেন তখন তাঁর সপক্ষে স্পষ্ট তথ্য তুলে ধরেছেন। আর লেখক যখন শিরোনামে হিন্দুদের 'আট শ্রেণীর নাগরিক এবং রাষ্ট্র-অনুমোদিত বর্ণবাদের শিকার' বলে অভিহিত করেন, তখন এটিকে আক্ষরিক অর্থেই মেনে নেওয়া উচিত। আনন্দ রঙ্গনাথন একজন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের প্রামান্যবাদের ছাপ তাঁর লেখায় স্পষ্ট, মূল বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ, এবং বইটিতে দেওয়া সমস্ত বাস্তব প্রমাণ প্রাসঙ্গিক পাদটীকা দ্বারা সমর্থিত এবং শেষের দিকে সমস্ত রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। বইটিতে মোট আটটি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় ভারতের বর্তমান প্রাসঙ্গিক সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা তুলে ধরে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে কীভাবে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কেবল হিন্দুদের প্রান্তিক করে না বরং 'সংখ্যালঘুদের' সন্তুষ্ট করার জন্য সচেতনভাবে সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে। বইটির আটটি অধ্যায়ে 'হিন্দু মন্দিরের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ', 'কাশ্মীরি হিন্দুদের প্রতি অবিচার', 'ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫', 'আরটিই আইন', অ-হিন্দুদের খুশি করে কিন্তু হিন্দুদের লক্ষ্য করে এমন আইন, 'বিচারব্যবস্থা যা প্রায় একচেটিয়াভাবে হিন্দুধর্ম সংস্কারের চেষ্টা করে', 'যারা লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করেছে এবং ধর্মান্তরিত করেছে তাদের উদযাপন' এবং 'উপাসনা স্থান আইন, ১৯৯১' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু বিষয়, উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু মন্দিরের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উন্মূলন এবং তাদের প্রতি অবিচারের বিষয়টি যেমন উল্লেখ করেছেন ; তেমনি লেখক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রসঙ্গে কতগুলো প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন। যেমন - যারা দাবি করেন যে আমরা এখন এক সর্বগ্রাসী, ফ্যাসিবাদী, 'হিন্দু রাষ্ট্রে' বাস করছি, তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত: এটি কোন ধরণের 'হিন্দু রাষ্ট্র' যেখানে কোটি কোটি হিন্দু আমাদের সংসদ, আদালত, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সংবিধানের মাধ্যমে কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয়, বরং অষ্টম শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে? এটি কোন ধরণের 'হিন্দু রাষ্ট্র' যেখানে রাম নবমী, হনুমান জয়ন্তী, দুর্গাপূজা মিছিল এমনকি গরবা উৎসবেও আক্রমণ করা হয় এবং পাথর ছুঁড়ে মারা হয়, শাস্তির বিধান নেই? এটি কোন ধরণের 'হিন্দু রাষ্ট্র' যেখানে একজন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সম্পদের উপর সংখ্যালঘুদের প্রথম অধিকার আছে? এটি কোন ধরণের 'হিন্দু রাষ্ট্র' যেখানে হিন্দুদের তাদের নিজস্ব ভূমিতে শরণার্থী হতে বাধ্য করা হয়, যেখানে ৪০,০০০ রোহিঙ্গা মুসলিমকে বসতি স্থাপন করা যেতে

পারে কিন্তু ৭,০০,০০০ কাশ্মীরি হিন্দুকে নয়, যারা এই দেশের আদি বাসিন্দা; যেখানে বিচার বিভাগ বলে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে ধর্ষণ, হত্যা এবং জাতিগতভাবে নির্মূলকারীদের বিচার করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে? এটা কেমন 'হিন্দু রাষ্ট্র' যেখানে হিন্দু মন্দিরগুলি একচেটিয়াভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে, যেখানে হিন্দুদের তাদের উৎসব উদযাপনের জন্য ওয়াকফ জমি ভিক্ষা করতে হয়, যেখানে সরকার লক্ষ লক্ষ একর মন্দিরের জমি দখল করে এবং লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ভাড়া আয় হারানোর জন্য দায়ী? এটা কেমন 'হিন্দু রাষ্ট্র' যেখানে শিক্ষা অধিকার আইন শুধুমাত্র হিন্দু এবং তাদের স্কুলের সাথে বৈষম্য করে, হাজার হাজারকে তাদের বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে? এটা কেমন 'হিন্দু রাষ্ট্র' যেখানে আওরঙ্গজেব এবং টিপুর মতো শোষকদের প্রশংসা করা হয় যারা বৃহৎ হিন্দু গণহত্যা ঘটিয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রচারণা, রাস্তাঘাট এবং শহরের নামকরণ এবং উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে? এটা কেমন 'হিন্দু রাষ্ট্র' যেখানে এমন একটি আইন প্রণয়ন করা হতে চলেছে যেখানে শুধুমাত্র হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দোষী সাব্যস্ত করা হত, এমনকি যদি তারা সংখ্যালঘু হয়, উদাহরণস্বরূপ কাশ্মীরে? এটা কেমন 'হিন্দু রাষ্ট্র' যেখানে শবরীমালার মতো আদালতের রায় এবং হিন্দু কোড বিলের মতো আইন প্রণয়ন শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি সংস্কারের কথা বলে কিন্তু অন্যান্য ধর্মের রীতিনীতি স্পর্শ করার সাহস করে না? ইত্যাদি, ইত্যাদি। একইভাবে, লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ২০০৯ সালে ইউপিএ শাসনামলে পাস হওয়া শিক্ষা অধিকার আইনের অনেক বিধান কেবল সংখ্যালঘু নয় এমন স্কুলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আরটিই-র অধ্যায়ে, আনন্দ রঙ্গনাথন ব্যাখ্যা করেছেন যে কীভাবে আরটিই আইন কেবল হিন্দু স্কুলগুলিকে বলির পাঁঠা বানিয়ে তাদের প্রতি পদ্ধতিগতভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করে না, বরং আরটিআই মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার কারণে আর্থিক সংকটের কারণে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত অনেক স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। 'সহজভাবে বলতে গেলে, আরটিই হিন্দু স্কুল এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে চলেছে। সম্ভবত, এটিই ধর্মনিরপেক্ষতার মূল লক্ষ্য - হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য প্রতিটি ধর্ম, তার বিশ্বাস ব্যবস্থা, তার জীবনযাত্রা, তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, তার শিক্ষা পদ্ধতি, তার জ্ঞান, তার বই এবং ধর্মগ্রন্থের সমৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া', অধ্যায়ের এই লাইনগুলি আরটিআই-এর অধীনে হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বিধাকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।

ইতিমধ্যেই মাত্র ১৫২ পৃষ্ঠার এই বইটি জনসাধারণের নজরে এসেছে। আয়তনে নয় , কিন্তু বইটির বিস্তৃতি এবং আলোচনার গভীরতা পাঠকের মন স্পর্শ করেছে। এই সংগ্রহটি তৈরিতে যে পরিমাণ গবেষণা করা হয়েছে তাতে এটি অসাধারণ একটি রচনা বলা যেতে পারে। এটি এমন অনেক "লুকানো তথ্য"র ভাণ্ডার তুলে ধরেছে যা মূলধারার গণমাধ্যম ও প্রকাশনা কখনও জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করে না। পাঠকদের এই ধরনের তথ্যের সরাসরি অ্যাক্সেস দেওয়ার মাধ্যমে, আনন্দ রঙ্গনাথন একটি বিকল্প মিডিয়া ডিসকোর্স এবং নাগরিক সাংবাদিকতার নজির স্থাপন করেছেন। শেষে প্রফেসর রঙ্গনাথন ক্লিনিক্যাল নির্ভুলতার সাথে লেখা এই বইয়ে একটা তীব্র মন্তব্য পাঠকের সামনে রেখেছেন যে স্বাধীনতার পর থেকে এক শ্রেণির হিন্দুদের যে অপরাধবোধ, আত্মবিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে প্রতারিত করা হয়েছে তার জন্য দায়ী কে? তিনি

মনে করেছেন এই ভাবনার কোন সত্যতা নেই, দাবির কোন রাজনৈতিক শুদ্ধতা নেই, একমাত্র অপ্রকাশিত সত্য - হিন্দুরা রাষ্ট্র-অনুমোদিত বর্ণবাদের অধীনে বাস করছে। আনন্দ রঙ্গনাথনের বইটি একাডেমিক বিতর্কগুলিতে প্রবেশ করে না, তবে এটি তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্রে তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু হওয়ার দ্বন্দ্ব এবং দুর্বলতাগুলির স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এটি এমন এক ধরণের বই যা পাঠককে তাদের নিজস্ব বিশ্লেষণাত্মক এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা দক্ষতা তীক্ষ্ণ করতে এবং "ধর্মনিরপেক্ষ" বিষয়গুলির চিত্রায়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে যুক্তি অনুসন্ধান করতে অনুপ্রাণিত করে। লেখক এই আটটি ক্যাপসুল-সদৃশ অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠককে দুর্দান্ত নির্দেশিকা দিয়েছেন, তবে পাঠকের নিজের অনুসন্ধিৎসু মন এবং সমালোচনামূলক বোঝাপড়ার কিংবা দক্ষতার দ্বারা বিষয়ের ব্যাখ্যান ও যুক্তি গ্রহণের দায়িত্ব সম্পূর্ণতই ব্যক্তিগত।

গ্রন্থ সমালোচক - স্বাধীন ঝা
সহকারী অধ্যাপক , ইতিহাস বিভাগ,
দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার